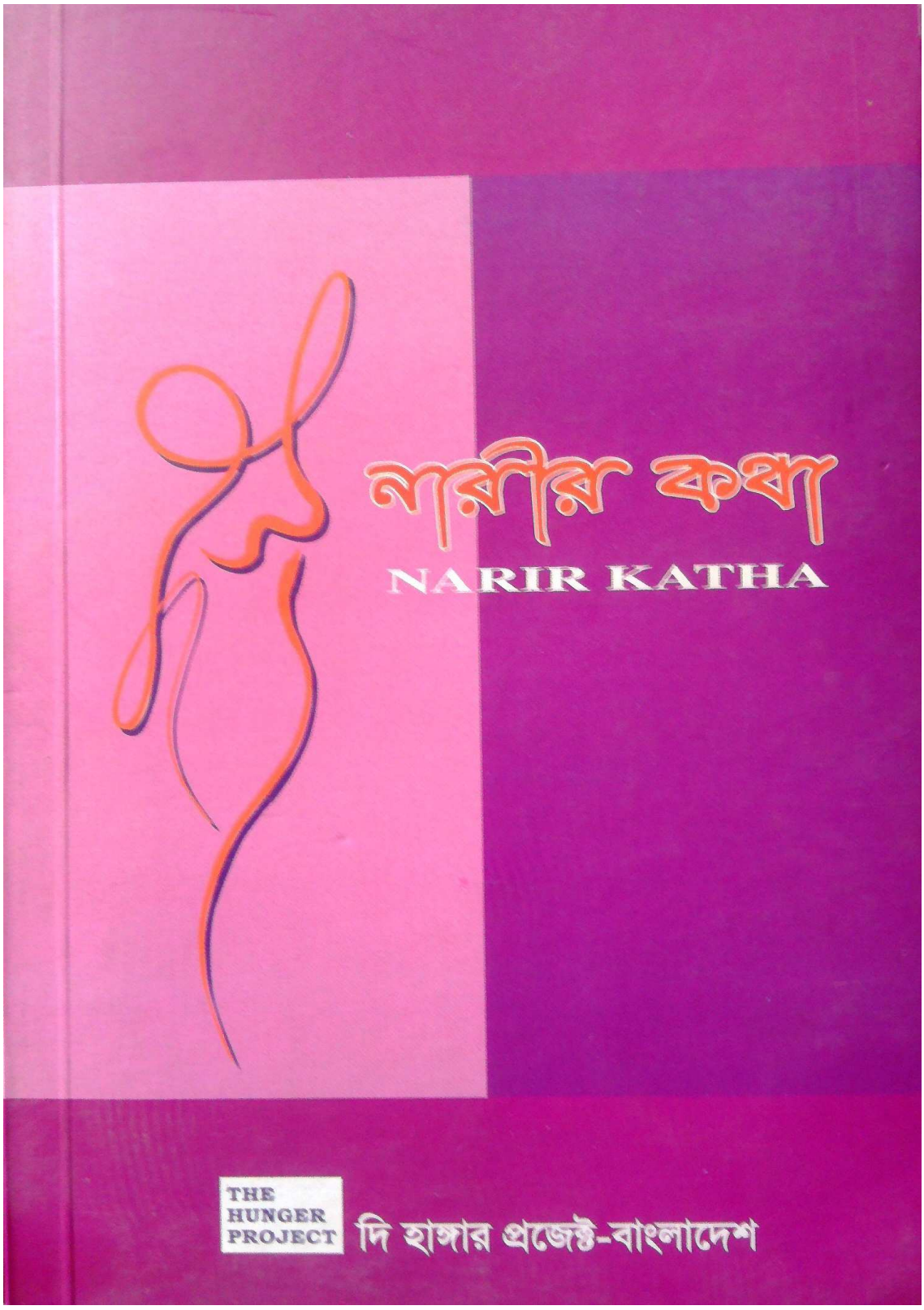
নারীর কথা
NARIR KATHA
THE HUNGER PROJECT
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

নারীর কথা - ৩

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদনায়
ড. বদিউল আলম মজুমদার

৮ মার্চ, ২০০৮

THE HUNGER PROJECT
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

নারীর কথা-৩

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

সহযোগী সম্পাদক
নাছিমা আক্তার জলি

নির্বাহী সম্পাদক
ড. মোস্তাফিজুর রহমান

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০০৮

কপিরাইট : দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ : রানা চৌধুরী

মুদ্রণে : ইনোসেন্ট
১৩২, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকঃ
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
৩/৭ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১১-২৬২২, ৮১২-৭৯৭৫, ফ্যাক্স : ৮১১-৬৮১২

ISBN 984-300-001868-9

Narir Katha - 3
(Collected writings on the 2nd national convention on Bikosito Nari Network)
First Published : April, 2008
Published by :
The Hunger Project-Bangladesh
3/7 Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207
Tel: 811-2622, 812-7975 Fax: 811-6812
E-mail: thpb@bangla.net
Web: www.thpbd.org, www.thp.org/Bangladesh

সূচিপত্র

ড. মোস্তাফিজুর রহমান ও সরস্বতী রানী পাল	♦ জীবন মানে সংগ্রাম আর এগিয়ে চলা
রাজেশ দে রাজু	♦ সাহসী সংগ্রামের অনন্য নাম: সৈয়দপুরের শানু
রোকসানা কনা	♦ জান্নাতের জয়যাত্রা
তুহিন আফসারী	♦ ষোল টাকার বানু মেম্বার
সৈয়দ সেলিনা শিরিন	♦ সাধারণ পরিবারের অসাধারণ দিপু
সুব্রত কুমার পাল	♦ জীবন যুদ্ধে জয়ী: ফজিলাতুন নাহার
কাজী ফাতেমা বর্নালী	♦ আলোকিত গীতা ও অন্যান্যদের গল্প
	♦ নতুন ভোরের স্বপ্ন ও একজন ইন্দু প্রভার গল্প
মুনমুন ইসলাম	♦ জীবন খুঁজে পেতে: দৃঢ়কল্প রত্নাদি
সিদ্দিক রুবেল	♦ জীবিকার যুদ্ধে জয়ী রাবেয়া আক্তার রিয়া
আবু জিসান এম. আলমগীর	♦ দৃঢ় সংকল্পে অটুট বিজলী
ড. মোস্তাফিজুর রহমান	♦ খাগড়াছড়ির পাহাড়ে শান্তির নতুন সূর্য
	♦ সমুদ্র পাড়ের সংগ্রামী নারী তাহমিনা জান্নাতের জয়গাথা
	♦ নারীবাদী শামীম আক্তারের গল্প
সরস্বতী রানী পাল	♦ অচলায়তন ভেঙে এগিয়ে চলেছেন দিঘুলিয়ার লাইলী বেগম
	♦ দুর্দান্ত সৈনিক: রওশন আরা
	♦ সংগ্রামী শাহানা
	♦ রাশিদা: অবিচল পথিক

সম্পাদকীয়

"মাতা ভগিনী, কন্যে! আর ঘুমিও না, উঠো" প্রায় শত বছর আগের বেগম রোকেয়ার এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের নারীরাও জেগে উঠছে। তারা ক্রমাগতভাবে সংগঠিত হচ্ছে। ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে তারা বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছে। নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করছে। অন্যের ভাগ্যোন্নয়নের সহায়তা করছে। কূপমণ্ডূকতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে সমাজকে এগিয়ে নেয়ার কাজে অবদান রাখছে। কিন্ত দুভার্গ্যবশত এ কাজে তারা প্রতি পদে পদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এমনকি রাষ্ট্রের কাছ থেকেও তারা প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছে না।

নারী জাগরণ এবং সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বের স্বীকৃতি হিসেবেই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের সংবিধানের বেশ কিছু অনুচ্ছেদে নারীর অধিকার ও তাদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন না করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অনুচ্ছেদ ১০-এ জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ, ১১-তে মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা, ১৫-তে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা, ১৭-তে বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান, ১৯-এ সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, ২৭-এ আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ২৮-এ নারী-পুরুষ ভেদে বৈষম্য না করা ও নারী-পুরুষের সমানাধিকার (বিনোদন ও শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রেও) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এমনকি অনুচ্ছেদ ২৮(৪)-এ বলা হয়েছে, 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।'

এ সকল সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য যে সাহসী ও বলিষ্ঠ উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল তা গ্রহণে, দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, অতীতের সরকারগুলো বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সরকারি উদ্যোগের মধ্যে ১৯৯৭ সালে ঘোষিত নারীনীতি অন্যতম; যদিও এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইনি কোন উদ্যোগ গৃহিত হয় নি। দুর্ভাগ্যবশত এ দলিলটিও সম্পূর্ণ গোপনে ২০০৪ সালে সংশোধন করা হয়, যা সচেতন মহলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় নি বরং ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। আনন্দের কথা যে, গত ৮ মার্চ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৯৭ সালের দলিলটির অবলম্বনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০০৮ ঘোষণা করেছে। কিন্তু একটি বিশেষ মহল এর বিরোধিতা করছে এবং অপপ্রচার চালাচ্ছে। বলা হচ্ছে – নারী সমতার প্রবক্তরা বিদেশীদের কাছ থেকে শেখা বুলি আওড়াছে। এ প্রেক্ষিতে তাদের স্মরণ করে দেয়া প্রয়োজন যে, নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি শত বছর আগেই প্রকাশ পেয়েছে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার লেখনীতে।

বিরূপ পরিস্থিতির নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নারীরা সামনে এগিয়ে চলছে। রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিতকরণ ও তাদের নেতৃত্বকে বিকশিত করার লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ২০০৬ সালে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করে। উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এক দল নারীকে সংগঠিত, ক্ষমতায়িত ও জাগ্রত করার ব্রত নিয়ে গড়ে ওঠে 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'। যার মূল লক্ষ্য নারীরা যেন নিজেরাই সর্বক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের মূল রূপকার হয়ে উঠতে পারে। নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মশালার মধ্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের বলিষ্ঠ করে তোলার সুযোগ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে এক ঝাঁক বিকশিত নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে। যারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের সহায়ক।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিকশিত এই নারীদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে বেশকিছু উদ্যোগ। তারা স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেরা আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসতে সহায়তা করছে। দান-অনুদান আর পরনির্ভরতার সংস্কৃতির বাইরে তাদের এ সকল দৃষ্টান্ত আজ অনেকের মধ্যেই আশাবাদ সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি চলছে সচেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারী উন্নয়ন। নারীর প্রতি সহিংসতা ও চলমান বৈষম্য দূরীকরণে এসকল নারী নেতৃত্ব সম্পুর্ণরূপে স্বেচ্ছশ্রমের ভিত্তিতে স্বপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে চলেছে।

'নারীর কথা' এ সকল দৃষ্টান্ত ও প্রচেষ্টার প্রামাণ্য দলিল। গ্রন্থটির সবগুলো কাহিনীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিটি গল্পই এক একজন নারীর সাহসী সংগ্রামের চিত্র। অধিকাংশ নারীই তাদের এই সাফল্যের কথাগুলো জীবনে প্রথমবারের মত বলার সুযোগ পেয়েছেন। আর এই সুযোগ সৃষ্টি করেছে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক। সাহসী সংগ্রামের এই সকল চিত্রের প্রেক্ষাপটে আমাদের অভিজ্ঞ করেছে যে, কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়, কোনো বাঁধাই বাঁধা নয়; যদি তা সমাধানের পথ তৈরি করার মনোভাব নিজের মাঝে জাগিয়ে তোলা যায়।

'নারীর কথা' একটি ধারাবহিক সংকলন। ২০০৬ সালে এর প্রথম সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল। সময়ের ধারাবাহিকতায় সাফল্যের সোপান বেয়ে তৃতীয় বারের মত ১৮ জন নারীর সফলতার কথা নিয়ে প্রকাশিত হলো **নারীর কথা-৩**। মাঠে পর্যায়ে সৃষ্ট আরো অসংখ্য নারীর সফলতার কাহিনী রয়েছে, যা এই স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব হয় নি। ভবিষ্যতে সাফল্য কথার প্রকাশনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি তাদের প্রতি যারা তৃণমূল পর্যায়ে এই সকল সফল নারীদের কথা সংগ্রহ করেছেন নানা প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে এসব তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যারা নানাভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের প্রতিও অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও কিছু মুদ্রণজনিত ও আনুষঙ্গিক ভুল-ত্রুটি রয়ে গেল। সাহসী সংগ্রামের নারীদের এ সকল সফলতার কথাগুলো যদি অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে, তবে সেটিই হবে গ্রন্থের সাফল্য।

ড.বদিউল আলম মজুমদার
গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

২০০৭ সালে নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে

ড. বদিউল আলম মজুমদার প্রদত্ত বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য অংশ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন উপলক্ষে একদল সম্মানিত অতিথিবর্গের সঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত বোধ করছি। আর এই ভেবে আমি খুব সম্মানিত বোধ করছি যে, এই মঞ্চে আসীন ক্ষমতাধর সব নারীদের মধ্যে আমি দূরদেশ থেকে আগত একজন পুরুষ।

আমি নিউইয়র্কে এসেছি 'নারীর অবস্থা সম্পর্কিত কমিশনের ৫১তম বিশেষ অধিবেশনে' যোগ দিতে। এ বছর অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে নারী ও কন্যাশিশুর উপর সংঘটিত সব ধরণের সহিংসতার অবসান। আমি আপনাদের জানাতে চাই, কেন আমি ব্যক্তিগতভাবে নারীর ক্ষমতায়ন চাই এবং কেন চাই নারীদের প্রতি সকল বৈষম্য ও সহিংসতার অবসান।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মত আমারও জন্ম হয়েছিল এক পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, যে সমাজ স্মরণাতীতকাল থেকেই পরিচালিত হয়ে আসছে বদ্ধমূল কিছু ধারণার দ্বারা, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল – পুরুষরা নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাদের সমাজে এই ধারণা অত্যন্ত প্রকট। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, আমি একজন মুসলমান।

আমার সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড ও ধর্মীয় বিশ্বাস সত্ত্বেও আমি কাজ করে যাচ্ছি নারীর ক্ষমতায়ন এবং তাদের জন্য নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে। নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে আমি নারীদের পুরুষের সমতুল্য হিসেবে বিচার করি। এছাড়া আরও দু'টি কারণে আমি নারী ও পুরুষের সমতায় বিশ্বাসী। এর মধ্যে একটি বাস্তব কারণ, আর অন্যটি বৈজ্ঞানিক কারণ। আমার কাছে নারীর ক্ষমতায়ন শুধু অন্ধ বিশ্বাস বা শ্লোগান মাত্র নয়, এটি আমার সুচিন্তিত অভিমত।

প্রথমেই আসি বাস্তব কারণ প্রসঙ্গে। কারণটি হলো 'অপুষ্টির দুষ্টচক্র', যার মর্মকথা-একজন পুষ্টিহীন মায়ের কারণে একটি গোটা সমাজই ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতার শিকার হয়। আমাদের সমাজে নারীর পুষ্টিহীনতা ব্যাপক। অপুষ্টির শিকার একজন নারী এমন সন্তানের জন্ম দেয়, জন্মের সময় যার ওজন থাকে স্বাভাবিকের চেয়ে অর্থাৎ আড়াই কেজির কম। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের রেওয়াজ অনুযায়ী মেয়েদের, বিশেষত নিম্নবিত্তের পরিবারের মেয়েদের সাধারণত কম খেতে দেয়া হয়। এছাড়া জন্মের পর তাদের যত্নও কম নেয়া হয়। কৈশোরে উপনীত হওয়ার পর তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত রাখা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়। এসব পুষ্টিহীন মেয়েদের বয়ঃসন্ধিক্ষণেই, শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রস্তুত হবার পূর্বেই বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। আর বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তারা সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়ে। এদের গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই ভোগে পুষ্টিহীনতায় এবং এভাবেই সমাজে আবর্তিত হতে থাকে অপুষ্টির দুষ্টচক্র। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নারীদের হতে হচ্ছে এই অপুষ্টি চক্রের মূল বাহক।

যে কারণে আমি নারীর ক্ষমতায়নের কাজে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি তার মূলে রয়েছে একটি অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য। যাকে বলা হয় ফিটেল প্রোগ্রামিং (Fetal Programming)। অর্থাৎ ভ্রুণ অবস্থায়ই একজন মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরেখা অঙ্কিত হয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, মায়ের পেটে থাকতেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনটি কেমন হবে তা নির্ধারিত হয়ে যায়। একের পর এক গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা আমাদের দেখিয়েছেন, স্বল্প ওজন নিয়ে যেসব শিশু জন্মগ্রহণ করে, পরিণত বয়সে তাদের মধ্যে হৃদরোগ বা ডায়াবেটিসের মত রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার অনেক বেশি। তাহলে আমরা আবারও দেখতে পাচ্ছি একজন নারীর পুষ্টিজনিত অবস্থার উপর কিভাবে একটি গোটা সমাজের স্বাস্থ্য ও সচ্ছলতা

নির্ভর করে। আর এ জন্যই নারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির ব্যাপারে আমার রয়েছে একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও সমর্থন। এই সমতা ও সুযোগ যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে আমার মতে গোটা মানব সমাজের অগ্রগতির পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইতোমধ্যে আপনারা জেনেছেন, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বাংলাদেশ সেই সব দেশের একটি যেখানে নারীর প্রতি বৈষম্য খুবই প্রকট এবং নারীর প্রতি সহিংসতা অত্যন্ত ভয়াবহ। বাংলাদেশে যদি কোনো মেয়ে একজন পুরুষের দেয়া অশোভন প্রস্তাবে রাজী না হয় তা হলে প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তি এসিড ছুঁড়ে তার মুখ ঝলসে দিতে পারে। যুগ যুগ ধরে এই জঘন্য অপরাধটি সংঘটিত হয়ে আসছে, কিন্তু এর জন্য অপরাধীকে কোনও সাজা দেয়া হয় নি। উল্টো আক্রমণের শিকার মেয়েটিকেই তার আত্মীয় স্বজন গৃহবন্দী করে রাখত, কারণ তার জন্য বাইরের সমাজে মুখ দেখানোটাই ছিল খুব লজ্জার বিষয়।

সেদিন আর নেই। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের স্বেচ্ছাব্রতী উজ্জীবকদের প্রষ্টোয় এবং আরো অনেক সংগঠনের উদ্যোগে এসিডদগ্ধ এই সব তরুণী ও নারীরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে, অর্জন করছে দক্ষতা, মনোবল ও আস্থা, যাকে অবলম্বন করে তারা বাইরের জগতের সামনে তুলে ধরছে এই অপরাধের বীভৎস দিকটি। সেই সাথে তারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে এই জঘন্য অপরাধের বিচার দাবী করতে।

বলতে আমার গর্ব হচ্ছে যে, গত বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমি আমার হাজার হাজার দেশবাসীর সঙ্গে মিছিলে অংশ নিয়েছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল হতভাগ্য এসিডদগ্ধ নারীদের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করা এবং এই অপরাধের জন্য কঠোরতম শাস্তির দাবী করা। বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কর্তৃক গৃহীত অসংখ্য পদক্ষেপের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম।

আমাদের আরেকটি সফল কর্মসূচি হচ্ছে প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশব্যাপী 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস' পালন করা। এই দিবসটি উদযাপনের মূল লক্ষ্য হলো, এমন গণসচেতনতা সৃষ্টি করা যে, সমাজে মেয়েদের গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। তাই তাদের যত্ন নিতে হবে, তাদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং তাদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। নারীর প্রতি সম-আচরণ করতে হবে এবং তা করতে হবে তার জন্মের পর থেকেই।

কন্যাশিশুর অধিকার অর্জনে বাংলাদেশে কাজ করছে এমন কয়েক শ' ব্যক্তি ও সংগঠনের একটি জোট আমরা গড়ে তুলেছি যার নাম দেয়া হয়েছে 'জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম'। এর প্রধান কাজ হচ্ছে প্রতি বছর বাংলাদেশের সর্বত্র এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালনের ব্যবস্থা করা। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে সরকারও আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিবসটি একান্তভাবেই মেয়েদের নিয়ে পালনের ঘোষণা দিয়েছে এবং এর ফলে সমাজে কন্যাশিশুরা এই দিবসটি উদযাপনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এখন আমি অন্য একটি প্রসঙ্গে যাচ্ছি। আমি জানি যে এই সমাবেশের অনেকেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন এবং এও জানি যে তাদের অনেকেই জেন্ডার বৈষম্যকে ইসলাম ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ভাবতে অভ্যস্ত। তবে আমরা মনে করি যে, যারা জেন্ডার বৈষম্যের সমর্থনে ইসলাম ধর্মের দোহাই দেয় তারা আসলে ইসলাম ধর্মের মূলবাণীকেই বিকৃত করছেন। কারণ ইসলাম ধর্মের মূলবাণীই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার কাছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমান।

আমি আপনাদের জানাতে চাই, নারী পুরুষের সমতা রক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানে রাখা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বলিষ্ঠ বিধান। তাই সবশেষে আমি বলতে চাই, নারীরা স্রষ্ঠার কাছে সমান, আইনের চোখেও সমান। তবুও দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এটি অন্যায়, এটি একটি অবিচার, এর অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া দরকার। আমরা এই পরিবর্তন সাধনে নিবেদিত। উল্লেখ্য যে, আমাদের নিজের এবং আমার সহকর্মীদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার বিষয়টি বাংলাদেশ তথা বিশ্বব্যাপী দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কাজকর্মে পেয়েছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

নারী : দেয়ালের ওপারে

নাছিমা আক্তার জলি

নারী নির্যাতন বা নারীর প্রতি সহিংসতা আজ সারা বিশ্বের এশটি বহুল আলোচিত সমস্যা। বহু শতাব্দী ধরে নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ হিসেবে দেখার পরিণতি এই নারী নির্যাতন। পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নারীকে বহন করতে হচ্ছে নিপীড়ন, নির্যাতন ও মৃত্যু যন্ত্রণার চিরায়ত চিহ্ন। উল্লেখ্য যে, নারীর প্রতি সহিংসতার কথা যখন বলা হয়, তখন আজকের বিশ্বে নারীরা যত রকমের ঘটনা ও পরিস্থিতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তার সবই নির্দেশ করা হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি রাজনৈতিক অধিকারহীনতার কারণে নারীর অবস্থান এখনো নাজুক। ফলে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠছে ও বেঁচে থাকছে। তবে আশার কথা হলো, নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হচ্ছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। একই সাথে চলছে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। যা আমাদেরকে আবার সাহসী করে তোলে। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নারীকে আরও বলিষ্ঠ ও প্রত্যয়ী হয়ে উঠতে শক্তি যোগায়। এই চিত্রগুলোই আরো পরিস্কার হতে পারে আমরা যদি কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করি।

কেস স্টাডিঃ ১

নিপা (ছদ্মনাম) সিলেটের মেয়ে। জন্ম হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে। একদিকে পারিবারিক কুসংস্কার অন্যদিকে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন – এই দুয়ের মাঝে পড়ে নিপার পক্ষে বেশিদূর লেখাপড়া সম্ভব হয় নি। সপ্তম শ্রেণির গণ্ডি পার হতে না হতেই নিপাকে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কিশোরী নিপাকে নিজের পথ থেকে মায়ের সংসারে ফিরে আসতে হলো 'খারাপ মেয়ে' (!) অপবাদ নিয়ে। বাবা ব্যক্তি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠানে ছোট্ট একটি চাকুরী করে। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। মায়ের সংসারে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেলাই এর কাজ করে নিপা। আস্তে আস্তে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রত্যাশায় এলাকায় একটি টেইলার্স এর দোকান দেয়।

নিপা, ভাগ্যলিখন বিশ্বাস করে না। তারপরেও বলতে হয় ভাগ্যের দোষেই নিপা রক্ষা পেল না। চলমান পুরুষতান্ত্রিকতার থাবা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পাড়ার বখাটে যুবকের প্রেম প্রত্যাখান করায় দিনে দুপুরে সে শিকার হয় শারীরিক নির্যাতনের। নিপার মুখের একটি অংশ এসিডে ঝলসে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তলপেটে লাথির আঘাতে নিপার শরীর থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করে। ক্লিনিকে নিপাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। বখাটেদের প্রভাব প্রতিপত্তি থাকায় থানা মামলা গ্রহণে অসম্মতি জানায়।তারপরও, বয়সে ছোট হলেও, ঘাত প্রতিঘাতে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে নিপা। সে ভীতু নয়। প্রতিবাদ করতেই হবে; প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই হবে; শুধু তার নিজের জন্য নয় – অন্য নিপাদের জন্যও। মুখ খুলতে হবে, আইনকে কার্যকর করতে হবে...

স্থানীয় সংগঠন ও অন্যান্য নারীদের সহযোগিতায় অবশেষে থানা মামলা গ্রহণে বাধ্য হয়। যদিও প্রায় ১ বছর হলো, নিপা এখনও সুস্থ নয়। প্রতিনিয়তই যাচ্ছে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে।

আসামীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। নিপাকে প্রায় প্রতিনিয়ত হুমকি দেয়া হয় কেস তুলে নেয়ার জন্য। নিপা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কেস তুলে নেয়া নয় – "বিচার চাই, বিচার হতে হবে, বিচার করতে হবে। এর মধ্য দিয়েই প্রমাণ করতে হবে- দেশে আইন আছে। আইনের প্রয়োগ আছে।"

নিপার মন্তব্য- "একজন নারীকে যদি কোন পুরুষ শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতন করে তবে মেয়েটি অপমানিত হওয়ার ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারে না। তবে আমি বলব- না, এটি ঠিক নয়। এ কারণেই আমরা মেয়েরা এত লাঞ্ছিত,

অপমানিত। শারীরিক বা মানসিক যে কোনভাবেই কাউকে নির্যাতন করা হলে প্রতিবাদ করা উচিত। এতে মান-সম্মানের কেন ক্ষতি হবে? বরং সামাজিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে সেই লোকটি, যে আমাকে নির্যাতন করেছিল।"

কেস স্টাডিঃ ২

রায়েনা সুনামগঞ্জের মেয়ে। সবেমাত্র এইচএসসি পাশ করেছে। বাবা-মায়ের অমতে ভালবেসে বিয়ে করেছিল আরিফকে। আরিফ এম কম পাশ করেছে। তখনও চাকুরী হয় নি। টিউশনির টাকায় দু'জনার সংসার ভালই চলছিল। বিয়ের ছয় মাস পরেই আরিফ সিটি ব্যাংকে অফিসার পদে যোগদান করে। চাকুরীর পাশাপাশি জমি/কেনা বেচার ব্যবসায় লিপ্ত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই আরিফ নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে বিত্তশালী ব্যক্তি হয়ে ওঠে। পরিবর্তন আসে জীবনাচরনে। আরিফের রাতের জগত এখন অন্য নারী এবং মদ। নিত্য এসব না হলে নাকি তার স্ট্যাটাস থাকে না। রায়েনা এখন আরিফের কাছে 'আনকালচারড' নারী হিসেবে চিহ্নিত। ইতোমধ্যেই রায়েনার দু'সন্তানের জন্ম হয়েছে। রায়েনা জীবনের তাগিদে ব্লক, বাটিক ও দর্জি বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ নিয়েছে। স্থানীয় বাজারে একটি দোকান নিয়েছে। মেয়েদের পোশাক বিক্রি করে। স্বামী আরিফের প্রচণ্ড আপত্তি। কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না। প্রতিরাতে রায়েনাকে ভীষণভাবে মারধর কওে সে। রায়েনা চক্ষুলজ্জার ভয়ে নির্যাতনের ঘটনা আড়াল করে রাখে। এমনকি নিকটতম আত্মীয়কেও জানায় না। কারণ, এসব ঘটনা জানলে সে আর লজ্জায় অপমানে কারো সামনে দাঁড়াতে পারবে না। সবাই কি ভাববে!

এদিকে আরিফের কড়া নিষেধাজ্ঞা তার এই নির্যাতনের ঘটনা কোন কাক পক্ষীও যেন না জানে। যে দিন জানবে সেদিনই সে রায়েনাকে তালাক দিবে। তালাকের ভয়ে ভীত রায়েনা আরও মুখ খোলে না।

১৩ মার্চ রায়েনার জন্য কালরাত্রি। আরিফের নির্যাতনে একটি দাঁত ভেঙ্গে গেছে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। রায়েনা পরের দিন আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে, পাওে নি। সামনে দাঁড়িয়েছে কন্যা সন্তানটি।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও রায়েনা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে পরাস্ত করেছে। ছুটে এসেছে নারী এ্যাডভোকেটের নিকট। না! মৃত্যুর কাছে পরাজয় নয়, মৃত্যুকে জয় করতে হবে। তাকে বাঁচতে হবে। সন্তানদের বাঁচাতে হবে। আরিফদেরকে পরাস্ত করতে হবে। লজ্জা দ্বিধা সংকোচের ভয়ে পরিবারকে সমাজকে না জানিয়ে দিনের পর দিন মুখ বুঁজে সহ্য করাটাই আরিফকে আরও দুঃসাহসী অমানুষ করে তুলেছে। আজ আরিফের বাবা-মা-ভাইও অদম্য রায়েনার পাশে দাঁড়িয়েছে...

কেস স্টাডিঃ ৩

কলি, ঢাকার খিলগাঁওয়ের মেয়ে। সবেমাত্র এসএসসি পাশ করেছে। সেই দেড় বছর বয়সে কলির বাবা মাকে ফেলে রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। কলির মা এরপর থেকেই মেয়ে নিয়ে ভাইয়ের সংসারে। মা লেখাপড়া জানে না। অন্যের বাড়িতে রান্না আর সেলাই এর কাজ করে সংসার চালায়।

কলি সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষ্যে লেখাপড়া বাদ দিয়ে বিসিক থেকে পাটের দ্রব্য সামগ্রী, মোমের পুতুল, কাগজের ফুল ইত্যাদি বানানো শেখে। এ থেকে কিছু উপার্জনও হয়, হঠাৎ করে একদিন বিসিক থেকে ফেরার পথে স্বামী এমদাদের চোখে পড়ে সে। সে খিলগাঁও এলাকার 'মাসল ম্যান' বলে খ্যাত। কলিকে মোহাম্মদ আলী। পথের মাঝে দেখেই পছন্দ করে ফেলে। কোন কথা নেই। যে কোন মূল্যে কলিকে তার পেতে হবে। ঐ দিনই কলিদের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব দেয় সে। দরিদ্র মা'র পক্ষে কোনভাবেই কলির এ বিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হলো না।

বিয়ের পরদিন থেকেই কলির জীবন পাল্টে গেল। মোহাম্মদ আলীর নির্দেশে কলির জীবন হলো কারাগাওে বন্দী। সে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না। এমনকি মোহাম্মদ আলী তাকে ঘরে রেখে তালাবন্ধ করে বাইরে যেত। এভাবেই কাটল কলির ছয় মাস।

কলির জীবনে সেই নির্যাতনের শুরু তা আজ অবধি চলছে এবং ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। কলি কয়েক বছর চক্ষু লজ্জার ভয়ে তার নির্যাতনের ঘটনা আড়াল করে রেখেছে। এখন খুব কাছের কেউ কেউ জানে।

কলির বর্তমানে ৬ বছরের একটি কন্যা সন্তান আছে। ঘরে খাবার নেই। স্বামী মোহাম্মদ আলী হেরোইনের নেশায় আসক্ত। বর্তমানে নিঃস্ব। হেরোইনের প্রেমে পড়ে ঘরের প্রতিটি জিনিস বিক্রি করে ফেলেছে। এখন প্রতিদিন কলিকে ন্যূনতম ৫০ টাকা করে স্বামীকে যোগান দিতে হয় নেশার খোরাক হিসেবে। দিতে না পারলেই চলে অসহ্য নির্যাতন।

কলির মনে পড়ে এক রাত্রির কথা। নেশার পয়সা যোগাড় করতে স্বামী হয়েও মোহাম্মদ আলী তাকে নিয়ে গিয়েছিল অন্য পুরুষের হাতে তুলে দিতে। সেদিনের কথা ভাবলে আজও শিউরে ওঠে কলি। সে প্রথমে বুঝতেই পারে না কেন এই গলিতে বেড়ানোর নামে মোহাম্মদ আলী তাকে সাথে করে নিয়ে যায়। স্বামী প্রাকৃতিক ডাকে একটু ভেতরে যাচ্ছে বলে আর ফিরে আসে না। ইতোমধ্যে চারজন যুবক এসে তাকে ঘিরে ধরে। তারা প্রস্তাব করে তাদের সাথে যাবার জন্য। কলি কারণ জানতে চাইলে উত্তর আসে, দুই বোতল ফেন্সিডিলের বিনিময়ে তার স্বামী তাকে তাদের কাছে তুলে দিয়েছে।

কলির মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো সেই মুহূর্তে যুবকদলের মধ্যে কোন একটু করুণা কাজ করেছিল। অথবা কলির কোন পূণ্যের কারণে সৃষ্টিকর্তার ইশারায় কলি সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল। এরপর কলি আর নিজেকে ধারে রাখতে পারে নি। থানায় গিয়েছিল। স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সে নিজেকে বিকিয়ে দেয় নি।

জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েছে কলি আনেক মূল্য দিয়ে। গুটি গুটি পায়ে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার অদম্য সংগ্রামে আজ সে লিপ্ত। স্মৃতি তাকে মাঝে মাঝে আতঙ্কিত করে তোলে। কিছু সময়ের জন্য সে হারিয়ে যায় বিভৎস স্মৃতির অন্তরালে। তারপরেও কলি ক্লান্ত নয়। পথ চলতে হবে। সে বিশ্বাস করে– আমাকে পারতে হবে। আমি পারব। সে আরও বিশ্বাস করে– মুখ খুলতে হবে, বলতে হবে। লজ্জা দ্বিধায় সংকোচে ভয়ে মুখ লুকিয়ে রাখলে চলবে না। বলার মধ্য দিয়েই আরও অনেকগুলো কলির ফুল হয়ে ফোটার সম্ভাবনাগুলো উদ্ভাসিত হবে।

বিভিন্ন সময়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনেকগুলো আইন-কানুন গৃহীত হয়েছে। এগুলো হলো পেনাল কোড, ১৯৬০; মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন আইন ১৮৮৬, ভবঘুরে আইন ১৯৪৩, মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন ১৯৭৪, শিশু আইন ১৯৭৪, বাল্যবিবাহ দমন আইন ১৯২৯, অর্থনৈতিক পাচার দমন আইন ১৯৩৩, যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২, দ্রুত বিচারের জন্য ট্রাইবুন্যাল এ্যাক্ট ২০০২।

আইনের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ হলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এবং নারীর দুর্বল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের কারণে এইসব অধিকাংশ আইনের অধীনে নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়াও একটি বিশেষ দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন– নারী নির্যাতন মামলাগুলোর বিচারের সাথে পুলিশ বিভাগ সরাসরি জড়িত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভুলভাবে এফআইআর দাখিল এবং বিদ্যমান আইন সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান, ধারণা না থাকায় মামলাগুলো অনেক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। উপরন্তু পুলিশ মনে করে যে, অধিকাংশ নারী নির্যাতন মামলা ভূয়া এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে পুরুষ আত্মীয়দের দ্বারা নারীরা এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

এসিড আমদানি, তৈরি ও বিক্রি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন থাকা সত্ত্বেও তা এখনও হ্রাস পায় নি। সর্বোপরি নিয়ন্ত্রণের মেকানিজম অকার্যকর হওয়ার কারণে এসিড সন্ত্রাস বাড়ছে। আইনে থাকলেও দেশে আজ পর্যন্ত কোন এসিড সন্ত্রাসীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় নি। ২০০২ সাল থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে ডিস্ট্রিক্ট এসিড কন্ট্রোল কমিটি গঠনের কথা থাকলেও মাত্র ৮/১০ জেলায় তা গঠিত হয়েছে। এমনকি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাও আইনটি সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন না। (এএসএফ, ভোরের কাগজ-১৬ আগস্ট, ২০০৫)

নারী নির্যাতনকে রোধ করতে হলে সবার আগে গুরুত্ব দিতে হবে মানুষের নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তনের ওপরে। নারীর প্রতি প্রত্যেককেই সচেতন ও সংবেদনশীল হয়ে উঠতে হবে। নারী নির্যাতন বিরোধী সংস্কৃতির চর্চা এবং সমমর্যাদা ও অধিকারে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে দেখার প্রবণতা তৈরি করতে হবে। সকল নারী যাতে নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে মুখ খুলতে পারে সেই সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই নারীর জন্য তথা সকল মানুষের জন্য অশান্ত দিনগুলো হয়ে উঠবে নুতন ও শুভ।

জীবন মানে সংগ্রাম আর এগিয়ে চলা

ড. মোস্তাফিজুর রহমান ও সরস্বতী রানী পাল

আকলিমা আক্তার নাছিমা। কৈশোরে জীবনের সংজ্ঞা না বুঝেই শুরু করতে হয়েছিল তাকে জীবন সংগ্রাম। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন একজন মানুষ হিসেবে। হাত বাড়িয়েছেন সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের জন্য। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সফল হয়েছেন। প্রত্যন্ত পল্লীতে জন্মগ্রহণের পর কেবলমাত্র স্বীয় প্রচেষ্টা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে বর্তমানে তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার একটি পরিচিত মুখ। সমাজের নির্যাতিত ও পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

আকলিমার জন্ম কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার পশ্চিমগাঁও গ্রামে। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে আকলিমা দ্বিতীয়। বাবা-মা এবং বড় ভাই ছিলেন সৌদী প্রবাসী। এ কারণে তিনি একই গ্রামে বসবাসরত খালা-খালুর সাথে বসবাস করতেন। পরিবারের অধিকাংশ সদস্য সৌদী প্রবাসী হওয়ার কারণে আকলিমাদের পরিবার ছিল আর্থিকভাবে সচ্ছল। পশ্চিমগাঁও গ্রামের পার্শ্ববর্তী কালিয়াপুর গ্রামে আকলিমার এক ফুপুর বসবাস। শৈশব থেকেই তারা আকলিমাকে বড় ছেলে আবুল কালামের বধূ হিসেবে পেতে চাইতেন। কিন্তু আকলিমার বাবা-মা কখনোই বখাটে প্রকৃতির কালামের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী ছিলেন না। ফলে উভয় পরিবারের মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আকলিমার বাবা-মা সৌদী আরব যাওয়ার পর ফুপুর পরিবার তার খালুর উপর বিয়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করে। এমনকি তাকে হত্যা করে আকলিমাকে অপহরণেরও হুমকি দেয়। কিন্তু খালু বিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। একের পর এক চাপ আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি অনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন। ১৯৯৩ সালে অপ্রাপ্ত আকলিমাকে আবুল কালামের সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। বিয়ের বিষয়টি আকলিমার বাবা-মার নিকট গোপন করা হয়। বিয়ের কিছু দিন পর তিনি বয়সের পরিণত্ব লাভ করেন এবং তিন মাসের মধ্যে গর্ভবতী হন। ১৯৯৪ সালে যখন আকলিমার বাবা-মা দেশে ফিরেন তখন আকলিমা নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ফলে বিষয়টি মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথই খোলা ছিল না।

বিয়ের পরপরই আকলিমাকে তার স্বামী নির্যাতন শুরু করে এবং মাত্র দুই মাসের মধ্যে তার গায়ে হাত তোলে। শ্বশুর-শাশুড়ি আকলিমার পক্ষে থাকলেও মাদকাসক্ত কালাম প্রতি রাতেই বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া ও তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করত। অপরিণত বয়সে গর্ভবতী হওয়ার কারণে তিনি একরকম অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। শ্বশুর-শাশুড়ি আকলিমার পক্ষে কথা বলার কারণে বিয়ের পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে কালাম আকলিমাকে নিয়ে আলাদা বাসায় ওঠে। এসময় একটু বাড়তি যত্ন কিংবা পুষ্টিকর খাবার দূরে থাক জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম খাবারটুকু পর্যন্ত আকলিমা পেতেন না। গর্ভবতী অবস্থায় দিনের পর দিন কেটেছে তার অনাহার ও অর্ধাহারে। অথচ স্বামী ঠিকই বাইরে থেকে খাবার খেয়ে আসতেন। কোনো কারণ ছাড়াই কালাম আকলিমাকে নির্যাতন করত। এক পর্যায়ে স্ত্রীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়।

অন্যদিকে আলাদা বাসায় থাকার পরও পছন্দের পুত্রবধূকে শ্বশুর-শাশুড়ি স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখতেন। তারা পুত্রবধূর জন্য গোপনে খাবার পাঠিয়ে দিতেন, আবার কখনো কখনো আকলিমা নিজেই শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসত। বাবা-মা দেশে ফেরার পর আকলিমার উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। কালাম এ পর্যায়ে আকলিমাকে তার বাবার বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দেয়। লোক মারফত মেয়ের অভুক্ত থাকার কথা জানতে পেরে বাবা-মা গোপনে আকলিমাকে ভাতের চাল পাঠাত। ১৯৯৪ সালে আকলিমা প্রথম সন্তানের জননী হন। কিন্তু কালাম অসুস্থ প্রসুতি ও অপুষ্ট সন্তানের দিকে বিন্দুমাত্র নজর রাখতেন না। এমনকি স্ত্রী-সন্তানের জন্য খাবার ও পরিধেয় কাপড় পর্যন্ত কিনতেন না। সন্তান প্রসবের বিয়াল্লিশ দিন পর আকলিমা পর পর তিন দিন না খেয়ে থাকেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গড়ায় যে খাদ্যাভাবে তার বুকের দুধ পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। দুধের অভাবে দেড় মাসের অবুঝ শিশুটি অনবরত কান্না করতে থাকে। ফলে আকলিমার বাবা-মা একরকম জোর করেই মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যান।

বাবারবাড়িতে আসার কিছুদিনের মধ্যে পারিবারিকভাবে সমগ্র পরিস্থিতির সুরাহা হয় এবং আকলিমা শ্বশুরবাড়ি ফিরে যান। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে কালাম পূর্বের ন্যায় আকলিমারকে নির্যাতন শুরু করে। বিদেশ যাওয়ার জন্য শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা আনতে আকলিমার উপর চাপ প্রয়োগ ও নির্যাতন শুরু করে। বিষয়টি নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে পুনরায় আলোচনা হয় এবং মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে আকলিমার বাবা কালামকে সৌদী আরব পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯৯৫ সালে কালাম সৌদী আরব যাওয়ার পর আকলিমা পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৯৭ এসএসসি পাশ করে ভর্তি হন কলেজে।

সৌদী আরব যাওয়ার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে আকলিমার নামে মাত্র ছয় হাজার টাকা পাঠান কালাম। বিদেশ থেকে পাঠানো এটিই ছিল তার প্রথম ও শেষ টাকা। প্রায় দুই বছর সেখানে অবস্থান করলেও আর কোনো টাকা তিনি পাঠান নি। ফলে সন্তানকে নিয়ে আকলিমা মারাত্মক আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হন। অর্থাভাবে সন্তানকে নিয়ে শুধুমাত্র বাবা ও শ্বশুরের দেওয়া সহায়তার উপর নির্ভর করে কোনোভাবে অর্ধাহার ও অনাহারে দিন কাটান। পরিস্থিতি যখন আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে তখন তিনি শ্বশুরের সাথে আলাপ করে বাবারবাড়ি চলে যান।

১৯৯৭ সালের শেষ দিকে কালাম দেশে ফিরে আকলিমার বাবারবাড়ি যাওয়া এবং লেখা-পড়াকে কেন্দ্র অশান্তির সৃষ্টি করে এবং আকলিমাকে নিয়ে তার এক বোনের বাসায় ওঠে। আকলিমার কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেন তিনি। পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়। মদ্যপান এবং স্ত্রী নির্যাতন যেনো তার পেশায় পরিণত হয়। বোন-দুলাভাই অনেক চেষ্টা করেও সমস্যার কোনো সুরাহা করতে পারেন নি। এক পর্যায়ে আকলিমা পুনরায় গর্ভবতী হন। এমতবস্থায় কালাম দ্বিতীয় বারের মত পুনরায় সৌদী আরব যান এবং খরচ বন্ধ করে দেন।

কালাম সৌদী আরব যাওয়ার পর আকলিমা ননদের বাসায় থাকতেন। ভোরণ-পোষণের সকল খরচ তারাই বহন করত। এমনকি দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের সকল খরচও। কালামকে একাধিকবার খবর দেওয়া হলেও কোনো লাভ হয় নি। একুশ মাস পর দেশে ফিরে খরচ বাবদ বোনকে নয় হাজার টাকা প্রদান করেন। কালাম পুনরায় আকলিমাকে নির্যাতন শুরু করে। বিষয়টি নিয়ে কালামের সাথে তার বোনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং তারা কালামকে বাসা থেকে বের করে দেয়। স্বামী ও দুই সন্তানকে সাথে নিয়ে বাবারবাড়ি ফিরে আসেন আকলিমা। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পুনরায় নিজের মধ্যে নতুন প্রাণের অস্তিত্ব বুঝতে পারেন। গর্ভবর্তী হওয়ার পর পরই আকলিমার উপর নেমে আসে পূর্বের ন্যায় শারীরিক নির্যাতন। অমানবিক নির্যাতনে আকলিমা একদিন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বিষয়টি নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে আলোচনা হয় এবং কালাম আকলিমাকে নিয়ে প্রথমে চাচারবাড়িতে এবং পরে বাবারবাড়িতে ওঠে। কিন্তু নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বাড়ে বৈ কমে না। একদিন স্ত্রীকে মারধর করার সময় কলামের চাচী আকলিমার সহায়তায় এগিয়ে এলে কালাম তাকেও

শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এরপর আকলিমা তার শ্বশুর ও চাচা শ্বশুরের পরামর্শে বাবারবাড়ি চলে আসেন। বাবারবাড়ি আসার কিছুদিনের মধ্যে আকলিমা তৃতীয় সন্তানের মা হন। কিন্তু সন্তান জন্মের আট দিন পর কালাম আকলিমার নিকট ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দেয়।

আকলিমার স্বামী যখন দ্বিতীয়বার সৌদী আরব গিয়েছিলেন তখন তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহায়তায় সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সময়ের অভাবে তিনি এ শিক্ষাকে কোনো কাজে লাগাতে পারেন নি। বাবারবাড়ি ফিরে আসার পর আকলিমা তার বাবার সহায়তায় একটি ক্রয় করে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন স্থানে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেন। বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে সেলাই ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেশ ভালোই আয় হতে থাকে তার।

কথায় আছে, সুখ সবার কপালে বেশিদিন স্থায়ী হয় না। আকলিমার ক্ষেত্রে এই প্রবাদটি বাস্তব সত্যে পরিণত হয়। যে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তিনি প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন সেই প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তার কু নজর পড়ে আকলিমার উপর। সম্মান না জীবিকা– এই প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে কাজটি ছেড়ে দেন তিনি। ফলে তার পথচলা অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সাথে সাথে আর্থিক সঙ্কটও দেখা দেয়। অর্থাভাবে চিকিৎসা করতে না পারায় তার ছোট মেয়েটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এভাবে কেটে যায় কিছুদিন। ২০০০ সালে আকলিমা তার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে একটি টেইলার্সের দোকান দেন। কিন্তু দোকান থেকে অর্জিত আয় দিয়ে সংসার চলত না। তারপরও এগিয়ে যেতে থাকেন। ২০০৩ সালে 'মানবকল্যাণ' নামে একটি প্রতিষ্ঠানে মাসিক ২০০০ টাকা সম্মানিতে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে গিয়ে পরিচয় ঘটে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী স্বপন শিকদারের সাথে। তার মাধ্যমে তিনি উজ্জীবক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারেন। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাকসামের চৌধুরী ম্যানসনে অনুষ্ঠেয় ৬১৫তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি।

প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতা দ্বিগুণ করে দেয় আকলিমার আত্মশক্তিকে। চার দিনের এই প্রশিক্ষণে তিনি খুঁজে পান নিজের নতুন রূপ। প্রশিক্ষণের পর স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে আকলিমা বলেন, ব্যক্তিগত ঘর-সংসার নিয়ে নানারকম জীবন জটিলতার কারণে একরকম হারিয়েই গিয়েছিলাম; কিন্তু উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে নতুনরূপে খুঁজে পাই। বুঝতে পারি, শুধু আত্মোন্নয়ন কিংবা ঘর-সংসার নিয়েই নারীর জীবন নয়। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের জন্যও সাধ্যমত কাজ করা প্রয়োজন।

আকলিমা যেহেতু সেলাই প্রশিক্ষণে পাওয়া শিক্ষাকে পুঁজি করে ভাগ্যোন্নয়নের সূচনা করেছিলেন। তাই প্রশিক্ষণের পর এই শিক্ষাকে ব্যবহার করে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ শুরু করেন। কর্মরত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গ্রামীণ অঞ্চলে প্রায় ১০টি ব্যাচে ২৮০ জন নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে প্রায় দুই শতাধিক নারী এই শিক্ষাকে পুঁজি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন। এছাড়া দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে আয়োজিত সেলাই প্রশিক্ষণের ৬টি ব্যাচে আকলিমা সহায়কের ভূমিকা পালন করেন। প্রতি ব্যাচে গড়ে ৩০ জন করে নারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই নারীদের অধিকাংশই আজ স্বাবলম্বী। এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি মোট ৪টি উজ্জীবক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। প্রশিক্ষণগুলোতে ৩৬০ জন নারী-পুরুষ (নারী-২২৫, পুরুষ-১৩৫) অংশগ্রহণ করেন।

নিজ উন্নয়ন আর প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যেই আকলিমা তার কাজকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। এলাকার উজ্জীবকদের সহায়তায় পশ্চিমগাঁও ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি একের পর এক উঠান বৈঠকের আয়োজন করে চলেছেন। বৈঠকগুলোতে বাল্যবিবাহের কুফল, যৌতুকের অভিশাপ, নারী নির্যাতন, মাতৃস্বাস্থ্য, পুষ্টিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ফলে নারী নির্যাতন ও নারী শিক্ষা, মাতৃস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে ইতোমধ্যেই পশ্চিমগাঁও ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে তিনি জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, লাকসাম শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এলাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস, কন্যাশিশু দিবসসহ বিভিন্ন দিবসগুলো উদযাপনে আকলিমা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

ইতোমধ্যে আকলিমা তার পূর্বের কর্মস্থল পরিবর্তন করে অপর একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্মরত হয়েছেন। দুই ছেলের মধ্যে বড় ছেলে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ শিখছে। অন্যদিকে ছোট ছেলে পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। আকলিমার স্বপ্ন তার সন্তানরা একদিন বড় হয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সহায়তায় কাজ করবে। তারা প্রমাণ করবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সকল পুরুষের চরিত্র এক নয়।

শৈশবে জীবনের কোনো মানে বোঝার পূর্বেই শুরু হয়েছিল লাকসামের পশ্চিমগাঁও গ্রামের সংগ্রামী নারী আকলিমা আক্তারের জীবন সংসার। সময়ের সাথে বুঝতে পেরেছিলেন জীবন আসলে কত কঠিন! জীবন সংগ্রামের নানা জটিলতায় পেছন ফিরে তাকানোর সময় হয় নি তার। কিন্তু তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করেছে তার আত্মশক্তি। যার উপর ভর করে নিজে সমৃদ্ধ হয়েছেন এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের স্বাবলম্বী হতে মমতার হাত বাড়িয়েছেন। এভাবেই এগিয়ে চলেছেন প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার এক নারী আকলিমা আক্তার নাছিমা।

সাহসী সংগ্রামের অনন্য নামঃ সৈয়দপুরের শানু

রাজেশ দে রাজু

সৈয়দপুর নীলফামারী জেলার একটি প্রাচীন শহর। বাঙালি-অবাঙালি মিশ্রিত এই শহরে লক্ষাধিক লোকের বসবাস। রুখসানা জামান শানু এই শহরেই বাস করেন। একজন সমাজকর্মী হিসেবে সৈয়দপুরের মানুষের কাছে তিনি বেশ পরিচিত। সৈয়দপুরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার সুবাদে এলাকার সকলের নিকট তিনি আজ 'শানু আপা' নামে পরিচিত।

রংপুরের মুন্সিপাড়ার একটি রক্ষণশীল পরিবারে শানু আপার জন্ম। সময়টি ছিল ১৯৬৬ সাল। আট ভাই-বোনের মধ্যে পঞ্চম। শৈশব থেকেই ছিলেন কিছুটা ডানপিটে স্বভাবের। পিতা সৈয়দ মকসুদ হোসেন পুলিশ অফিসার এবং মা হাদিছা বেগম ছিলেন গৃহিণী। আর্থিকভাবে সচ্ছল জন্ম হওয়ায় শৈশবে কোনো কিছুর অভাববোধ করতে হয় নি তাকে।

রংপুরের মুন্সিপাড়ায় শানুর জন্ম হলেও তার বেড়ে ওঠা, শিক্ষাজীবন ও শৈশবের অনেকটা সময়ই কাটে সৈয়দপুরে। সৈয়দপুরের 'রামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়'-এ শুরু হয়েছিল শানুর শিক্ষাজীবন। 'তুলসীরাম গালর্স হাই স্কল'-এ থেকে ১৯৮২ সালে এসএসসি পাশ করেন। বাবার কর্মস্থল রাজশাহীতে ছিল বলে ভর্তি হন রাজশাহী সিটি কলেজে। এখানে দুই বছর অতিক্রান্ত করার পর পুনরায় সৈয়দপুরে ফিরে যান এবং ১৯৮৪ সালে সৈয়দপুর ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। এইচএসসি পাশের পর উচ্চ শিক্ষাকে কেন্দ্র করে শানুর সাথে পরিবারে মনোমালিন্য দেখা দেয়। মেয়ে মানুষের এত পড়ে কি হবে– এই বাক্যটির বিরুদ্ধে শানুকে সংগ্রাম করতে হয়েছে অনবরত। পরিবারে এরূপ আচরণে সাময়িকভাবে মন খারাপ হলেও থেমে থাকতেন নি তিনি। ভাইদের সাথে একরকম জেদ করেই রংপুর কারমাইকেল কলেজে বিকম শ্রেণিতে ভর্তি হন। শিক্ষা জীবনকে চলমান রাখার জন্য একটি সচ্ছল পরিবারের সন্তান হওয়ার পরও অন্যের বাড়িতে লজিং শিক্ষক হিসেবে থাকতেন। এভাবে কেটে যায় এক বছর। মেয়ে হিসেবে জন্মগ্রহণ করায় এক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয় তাকে। বাধ্য হয়ে ফিরে আসেন সৈয়দপুরে। কিন্তু এরপরও লেখা-পড়া অব্যাহত রাখেন। ১৯৮৬ সালে বিকম পাশ করেন তিনি।

কলেজ জীবন থেকেই শানু লেখাপড়ার পাশাপাশি টিউশনি করতেন। মাঝে কিছু দিন 'সৈয়দপুর পাইলট গালর্স হাই স্কুল'-এ খণ্ডকালীন শিক্ষকতাও করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি 'অন্তরঙ্গ' খেলাঘর আসরের সাথে যুক্ত ছিলেন। ফলে লেখা-পড়ার পাশাপাশি নাচ-গান-উপস্থাপনা-অভিনয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার ছিল সমান পারদর্শিতা। যদিও রক্ষণশীল পরিবার সেটা কখনোই মেনে নিত না। কলেজ জীবনের শুরু থেকেই শানু সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করতেন। 'রংপুর কারমাইকেল কলেজ'-এ অধ্যয়নকালে গোপনে স্থানীয় পর্যায়ে সাংবাদিকতা করতেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়। বিষয়টি নিয়ে পরিবারে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে ছদ্ম নামে লেখালেখির কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

বাবার চাকরির সুবাদে শৈশবেই শানু রংপুর, সৈয়দপুর, রাজশাহী, ঈশ্বরদী, গাইবান্ধা, শান্তাহার, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। এ সময় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনচিত্র তার শিশু মনকে নাড়া দেয়। তিনি মেয়েদের বিভিন্ন কর্মের সাথে যুক্ত থাকতে দেখেছেন। এছাড়া প্রচার মাধ্যমের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও লেখায় মেয়েদের লেখা-পড়া এবং চাকরি করতে দেখে অনুপ্রাণিত হতেন। ভাবতেন, লেখাপড়া করে একদিন আমিও চাকরি করব, সংসারের হাল ধরব!

শৈশব থেকেই শানু লেখা-পড়া শেষে কিছু একটা করার স্বপ্ন দেখতেন। বিকম পাশ করার পর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য চাকরি খুঁজতে শুরু করেন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে এয়ার হোস্টেসের জন্য আবেদন করেন এবং প্রাথমিকভাবে নির্বাচিতও

হন। কিন্তু চূড়ান্ত নির্বাচনে বাদ পড়েন। বিষয়টি মনোকষ্টের কারণ হলেও ভেঙ্গে পড়েন নি তিনি। ১৯৮৮ সালে কর্নসান-বাংলাদেশ নামের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ পান। পাঁচ বছরের এই প্রকল্পে তিনি নারী অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করেন। কিন্তু প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে শানু পুনরায় বেকার হয়ে পড়েন।

১৯৯২ সাল ছিল শানুর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছর তিনি ঢাকার বাসিন্দা সেলিমুজ্জামান জনির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে পারিবারিকভাবে বিয়ে সম্পন্ন হয়। শানুর স্বামীর কর্মস্থল ছিল খুলনায়। তাই শানুও স্বামীর সাথে খুলনায় বসবাস শুরু করেন। রক্ষণশীল পরিবারে বেড়ে উঠলেও শানুর স্বামী ছিলেন উদার প্রকৃতির এবং একজন বন্ধুসুলভ মানুষ। তিনি শানুর প্রতিটি কথার মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

কনসার্ন-বাংলাদেশে কাজ করার সময় শানু রংপুর কারমাইকেল কলেজে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এমএ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু চাকরির পাশাপাশি লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। বিয়ের পর তিনি স্বামীর উৎসাহ ও আগ্রহের কারণে পুনরায় লেখাপড়া শুরু করেন এবং ১৯৯৪ সালে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। একই বছর বিসিকের একটি প্রকল্পে কাজের সুযোগ পেয়ে সাতক্ষীরায় চলে যান। দুই বছর পর প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে তিনি খুলনায় ফিরে আসেন। ১৯৯৫ সালে শানু কন্যা সন্তান এবং ১৯৯৭ সালে পুত্র সন্তানের জননী হন। দুই সন্তান জন্মের পর তাদের আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। চারজন মানুষের খরচ স্বামীর একার পক্ষে নির্বাহ করা সমস্যা হচ্ছিল দেখে শানু নতুনভাবে কিছু করার কথা ভাবতে শুরু করেন। স্বামীর কর্মস্থল ছিল ঢাকা-খুলনা কেন্দ্রিক। তাই তিনি ঢাকায় অবস্থান করে এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু ব্যবসায় খুব একটা ভালো করতে পারেন নি। ২০০০ সালে শানু বাবারবাড়ি সৈয়দপুরে চলে আসেন এবং 'মেরিগোল্ড টিউটোরিয়াল ইংলিশ হাই স্কুল' নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্লে এবং নার্সারি শ্রেণির মাত্র আট জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন তিনি। স্বল্প পরিসরে চলতে থাকে তার এই শিক্ষা কার্যক্রম। পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছামূলকভাবে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ শুরু করেন।

স্কুল পরিচালনা এবং নারী ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত হওয়ার ফলে সৈয়দপুরের বিভিন্ন মহলে শানু একটি পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। তবে তার এই কাজগুলো ছিল অনেকটাই অপরিকল্পিত। এ সময় তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এবং উজ্জীবকদের বিভিন্ন সফলতা সম্পর্কে জানতে পারেন। পরবর্তীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উত্তরাঞ্চলীয় সমন্বয়কারীর সাথে তার পরিচয় হয় এবং তার আমন্ত্রণে ২০০৬ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্বের বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণের সময় শানু সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীদের সংগ্রাম ও সফলতা সম্পর্কে জানতে পারেন। প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর অধিকার, চাওয়া-পাওয়ার বিষয়গুলো জানতে পেরেছি। এছাড়া নারীর অধিকার আদায়ের জন্য নারীদেরই দায়িত্ব নিতে হবে– এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। প্রশিক্ষণের পর শানু সৈয়দপুরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। এলাকার কয়েকজন নারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটি দল গঠন করেন। দলের সদস্যরা শহরের বিভিন্ন এলাকাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে উঠান-বৈঠক, আলোচনা সভা, ইস্যুভিত্তিক কর্মশালা, বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় সভা প্রভৃতির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে শুরু করেন। এ সকল অনুষ্ঠানে মা ও শিশুস্বাস্থ্য, নারী নির্যাতন, শিশু ও নারী পাচার রোধ, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, সবুজ বনায়ন, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হত। প্রতি মাসে তারা একত্রিত হয়ে পূর্বের মাসের কার্যক্রম তদারক এবং পরবর্তী মাসের কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ করেন। দলনেত্রী হিসেবে শানু পুরো কাজের তত্ত্বাবধায়ন করে থাকেন।

শানু তার কার্যক্রমকে শুধুমাত্র জনসচেতনতা সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। এলাকায় যে কোনো ধরণের নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটলে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে তা বন্ধের চেষ্টা করেন। উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সৈয়দপুরের পার্শ্ববর্তী পোড়াহাট ইউনিয়নের আসমা নামের ১৪ বছরের এক কিশোরীর বিয়ের

আয়োজন করে তার পরিবার। বিষয়টি জানতে পেরে শানু ঘটনাস্থলে গিয়ে বিয়ে বন্ধের জন্য মেয়েটির পরিবারের সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু পরিবারের সদস্যরা রাজি না হওয়ায় তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করেন এবং প্রশাসনের সহায়তায় মেয়েটি বাল্যবিবাহের হাত থেকে রক্ষা পায়। অনুরূপভাবে ২০০৭ সালের শেষের দিকে সৈয়দপুরের বাবু পাড়ায় তাসলিমা নামের ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরীর বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করেন। এরূপ উদ্যোগ শানু প্রতিনিয়ত করে চলেছেন।

সময়ের সাথে শানুর 'মেরিগোল্ড টিটোরিয়াল ইংলিশ হাই স্কুল'-এর পরিধি বেড়ে চলেছে। বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়ার পর শানুর চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটে। তাই সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্লাসে পাঠ্যসূচির বাইরে সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। নিয়মিত পাঠচক্রের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্ত মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে তারা মুক্ত চিন্তা চর্চার সুযোগ পাচ্ছে, যা তাদের বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

বর্তমানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কুড়ি জন তাদের সামর্থ্যানুযায়ী বেতন প্রদান করে থাকে। আবার অনেক ছাত্র-ছাত্রী একেবারেই বিনামূল্যে লেখা-পড়া করছে। কৃষক ও দরিদ্র ঘরের সন্তানরাই এখানে বেশি পড়তে আসে। শানু বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা, গবেষণার কাজ, পত্রিকায় সাংবাদিকতা প্রভৃতির মাধ্যমে যে অর্থ অর্জন করেন তা দিয়ে স্কুলের মূল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। স্কুলে আট জন শিক্ষক ও সমসংখ্যক শিক্ষিকা রয়েছে। শিক্ষকদের অধিকাংশই বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ব্রিটিশ কাউন্সিলের আয়োজনে জাতীয়ভাবে গল্পবলা প্রতিযোগিতায় তিনবার, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় চারবার, বিজ্ঞান মেলায় একবার পুরস্কার পেয়েছে সৈয়দপুরের ব্যতিক্রমী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। স্কুলটিতে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার জন্য ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাতকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। ইতোমধ্যে জাতীয়ভাবে সুনাম অর্জন করায় ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কুলটিকে ১৪টি কম্পিউটার প্রদান করেছে।

শ্রমজীবী নারীদের উন্নয়নের জন্য শানু সৈয়দপুরে গড়ে তুলেছেন 'শ্রমজীবী নারী সংগঠন'। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি এর মূল দায়িত্ব প্রদান করেছেন শ্রমজীবী নারীদের উপর। তারাই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। শানু উপদেষ্টা হিসেবে শুধুমাত্র মিটিং ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত থাকেন। সৈয়দপুরের গণ্ডি পেড়িয়ে শানু তার কার্যক্রমকে নীলফামারী জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-নীলফামারী জেলার সভাপতি।

উল্লিখিত কাজগুলোর পাশাপাশি শানু সাংবাদিকতার সাথে জড়িত। বর্তমানে তিনি দৈনিক যুগান্তরের সৈয়দপুর প্রতিনিধি এবং সাপ্তাহিক ঢাকা পোস্ট-এর রংপুর ব্যুরো প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কর্মজীবনে খুলনার দৈনিক পূর্বাঞ্চল, রংপুরের দৈনিক দাবানল, সৈয়দপুরের দৈনিক আলাপনসহ বিভিন্ন পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। তার লেখাগুলোতে তৃণমুল মানুষের জীবন-সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে।

প্রতিনিয়ত কিছু করার তাড়না থেকেই রুখসানা জামান শানুর ছুটে চলা। কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়, যদি তা সমাধানের পথ তৈরি করার মনোভাব নিজের মাঝে জাগিয়ে তোলা যায়– শানু আপার এই সুন্দর বাক্যটিই তাকে দিয়েছে সাহসী পথ চলার শক্তি। তার এগিয়ে চলার পথ আমাদের মাঝে প্রত্যাশার আলো জাগ্রত করে। তার নানাবিধ কর্মকাণ্ড আমাদের করে অনুপ্রাণিত, চলার পথকে করে প্রশস্ত, দেখায় আপার সম্ভাবনার স্বপ্ন। এভাবে প্রতিটি গ্রামে এক একজন শানু আপা সংগ্রামের অগ্রপথিক হয়ে এগিয়ে এলে, নারীর জেগে ওঠা দূরের কোনো স্বপ্ন নয়। সাহসী সংগ্রামের অনন্য নাম– গল্পের প্রেক্ষাপটে তাই আমাদেরও বলতে দ্বিধা নেই 'জয়তু শানু'।

জান্নাতের জয়যাত্রা

রোকসানা কনা

উষ্ণ অভ্যর্থনা নয়, জন্মলগ্নে জান্নাত পেয়েছিলেন বৈষম্যময় পৃথিবীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া। তার আগমন বার্তায় বয়ে যায় নি খুশীর জোয়ার; বরং পরিবার তাকে বরণ করে নেয় আক্ষেপ আর আহাজারির মধ্য দিয়ে। কারণ একটিই, জান্নাতের জন্ম কন্যাসন্তান হিসেবে। সেদিনের সেই অনাকাঙ্ক্ষিত কন্যাশিশুটি আজ অসংখ্য মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস, অসহায় নারীদের পথপ্রদর্শক। জীবনের অনেক চড়াই-উৎড়াই পাড় করে আজ নিজেকে সফল দাবি করতে পারেন জান্নাত। তবে চলার পথে বাধা এসে পথ রোধ করেছে অনেকবার, কিন্তু তিনি হার মানেন নি। জান্নাতের জীবনের শুরুটা তাই আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো হলেও দারিদ্র ও বঞ্চনার গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যান নি তিনি। কারণ, তার ছিলো নিজের মেধা ও চেষ্টার ওপর ভরসা, আর ছিলো অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং ভাগ্যকে জয় করার বাসনা।

অম্ল-মধুর শৈশব-কৈশোর

চারটি কন্যাসন্তানের পর পরিবারের সকলের, বিশেষত মায়ের ইচ্ছে ছিলো পুত্রসন্তান হবে। তাই পঞ্চম কন্যাসন্তান হিসেবে জান্নাতের যখন জন্ম হয় তখন চারদিকে কান্নার রোল পড়ে যায়। এমনকি একটি পুত্রসন্তানের আশায় পরিবারের সদস্যরা জান্নাতের পিতাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দেওয়ার সকল আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। কিন্তু পিতার আগ্রহ না থাকায় শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। জন্নাতের পিতা মরহুম আফসার উদ্দীন চৌধুরী ছিলেন চট্টগ্রামের নামকরা সিনেমা হল 'জলসা'-এর ম্যানেজার। মা বেগম আখতারুন নেছা গৃহিনী। ফটিকছড়ি থানার সুন্দরপুর ইউনিয়নের আজিমপুর গ্রামে ১৯৭২ সালের ১১ মার্চ জান্নাতের জন্ম। জান্নাতের জন্মের পাঁচ বছর পর তার ছোট ভাইয়ের জন্ম হয়। পুত্রসন্তান হিসেবে ভাইয়ের প্রতি পরিবারের সকলের বাড়তি আগ্রহ ও যত্ন জান্নাতকে ছেলেবেলা থেকেই জেদী করে তোলে। তিনি লক্ষ্য করেন, খাবার থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ বৈষম্য বিরাজমান। তাই সিদ্ধান্ত নেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এ চলমান বৈষম্যের জবাব দেবেন। নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য জান্নাত শৈশব থেকেই পড়াশোনায় মনোযোগী হন।

চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে জান্নাতের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। জান্নাতের বাবা সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বাবার আগ্রহ ও উৎসাহের কারণে মেয়েরাও ভালোভাবে লেখাপড়া করতেন। প্রাথমিক পাঠ শেষে হাইদ চকিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন জান্নাত। এই বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৭ সালে মানবিক বিভাগে এসএসসি পাশ করেন। এরপর নাছিরাবাদ সরকারি মহিলা কলেজ থেকে ১৯৮৯ সালে এইচএসসি এবং ১৯৯১ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি বিএনসিসি'র সাথেও যুক্ত ছিলেন। এছাড়া নিজেকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্র জীবনেই গ্রহণ করতেন বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ।

পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনে জান্নাত ছিলেন সদা সচেতন। শুধু ঘরের কাজই নয়, মায়ের সাথে বাজার করা থেকে শুরু করে কৃষি কাজও দেখাশোনা করতেন। ছেলেদের ন্যায় ধান কাটা, বীজতলা ওঠানো, পুকুরে জাল ফেলানো প্রভৃতি কাজগুলোতে জান্নাত ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এসব কাজের জন্য তাকে বিভিন্ন সময় আত্মীয়-স্বজনদের ভৎসনাও সহ্য করতে হয়েছে। জান্নাতের চাচারা তার মাকে ডেকে জান্নাতকে শাসন করতে বলতেন।

বন্ধুর পথচলা

কাজী জসিম উদ্দীনের সাথে জান্নাতের ভালো লাগার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এইচএসসি পাশের পর পরই। স্নাতক পরীক্ষার শেষ দিন ১৯৯১ সালে পরিবারের অমতেই বিয়ে করেন তারা। জসিম একটি ফোনের দোকান পরিচালনা করতেন এবং তিনি ছিলেন এইচএসসি পাশ। এ কারণে জান্নাতের বাবা-মা প্রথমে এ বিয়ে মেনে নেন নি। তবে পরবর্তীতে মেয়ের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মেনে নিয়েছিলেন।

শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করা মাত্রই জান্নাত মুখোমুখি হন এক চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির। স্বামীর আয় তেমন ভালো না হওয়ায় প্রতি মুহূর্তে তাকে সকলের গঞ্জনা সহ্য করতে হত। পরিবারের সবার মন রক্ষার জন্য তিনি নিজ তাগিদেই সংসারের সব কাজ করে দিতেন। এভাবে কিছু দিন কেটে যায়। জসিম সংসারের খরচ দিতে পারতেন না বলে দু'বছর পর তাদের আলাদা করে দেয়া হয়। জান্নাত স্বামীসহ চট্টগ্রামের বৌবাজারে মামাশ্বশুরের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে মামার জমিতে সবজি ও বিভিন্ন ফল-মূল চাষ শুরু করেন।

শৈশব থেকেই জান্নাত বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। এজন্য সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের প্রতি একটা আলাদা টান ছিল তার। বৌবাজারে বসবাসের সময় ঐ এলাকার বস্তির ৩০ জন শিশুকে বিনামূল্যে পাঠদান করতে থাকেন। শিশুরা বাসায় এসে জান্নাতের কাছে লেখাপড়া করত। বিষয়টি মামা শ্বশুরের কাছে ভালো লাগে নি এবং তিনি বস্তির শিশুদের বাড়িতে এনে পড়ানোর অভিযোগে ১৯৯২ সালে গর্ভবতী অবস্থায় স্বামীসহ জান্নাতকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। তবে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়ার আর একটি অন্যতম কারণ ছিলো জসিমের মাদকাসক্তি। জসিম প্রতি রাতে মদ খেয়ে ভোর পাঁচটায় বাড়ি ফিরতো। এছাড়াও তার জুয়া খেলার নেশা ছিলো। বিষয়টি জানার পর মামা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

মামারবাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ভাড়া বাসায় ওঠেন তারা। বাজার করার সামর্থ্য না থাকলেও থেমে থাকে নি জসিমের নেশার আসক্তি। যা আয় হত তা দিয়ে মাদক সেবন করে ঘরে এসে জান্নাতের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাতেন। এমনকি সন্তান জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি স্বামী কর্তৃক শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হন। সংসার ও সন্তানের খরচ যোগানোর জন্য তিনি কাজের সন্ধান শুরু করেন জান্নাত। একটি গার্মেন্টসের সাথে যোগাযোগ করে সাতটি সুয়েটার নিয়ে আসেন হাতের কাজ করার জন্য। কিন্তু বাড়ি থেকে বের হয়ে কাজ করার জন্য তার ওপর নির্যাতনের মাত্রা

বাড়তে থাকে। আবার সংসারের খরচ চালানোর সামর্থ্যও ছিলো না জসিমের । ফলে মারাত্মক অর্থকষ্টের মধ্যে তাদের দিন কাটতে থাকে। এ সময় জান্নাতের ভাসুর তাদের সবাইকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন।

ভাসুরের বাড়িতে অবস্থানের সময় ১৯৯৪ সালে জান্নাত যুব উন্নয়ন থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণকে কেন্দ্র করেও তার ওপর নিয়মিত নির্যাতন চলতে থাকে। এমনকি কেউ তাকে রক্ষা করতে এলে তাকেও মারধোর করত জসিম। এ সময় জান্নাত দ্বিতীয় সন্তানের মা হন। সন্তান জন্মের আগে তার পিতৃত্বকে অস্বীকার করেন জসিম, যদিও সন্তান জন্মের পর আবার সব কিছু ঠিক হয়ে যায়।

সাফল্যের পথে যাত্রা

সেলাই প্রশিক্ষণের পর জান্নাত তার বোনের কাছ থেকে সেলাই মেশিন নিয়ে কাপড় সেলাই করা শুরু করেন। ধীরে ধীরে তার আয় বাড়তে থাকে। নিজস্ব আয় থেকেই সেলাই মেশিনের মূল্য পরিশোধ করেন। ১৯৯৭ সালে জান্নাতের ভাসুর অন্যত্র বদলি হয়ে গেলে জসিম তাকে গ্রামের বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হন নি। একটি বাসা ভাড়া নিয়ে সেখানেই সেলাইয়ের কাজ চালিয়ে যান। পাশাপাশি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন চাকরি ও কাগজ-কলম সরবরাহের কাজ নেন। স্বামীকে না জানিয়ে যুব কল্যাণ থেকে ১৯৯৮ সালে জান্নাত স্ক্রিন প্রিন্টের কাজ শেখেন।

চাকরির কথা জানতে পেরে জসিম জান্নাতের চুল কেটে দেন এবং ব্যবসা থেকে অর্জিত ৩৬ হাজার টাকা কেড়ে নেন। কিন্তু তারপরও হার মানেন নি জান্নাত। বরং নতুন করে কাজ শুরু করেন। সেলাই করা কাপড় দোকানে বিক্রির পাশাপাশি সিঙ্গারা, সমুচা বানিয়ে দোকানে সরবরাহ করতে শুরু করেন। ভিজিটিং কার্ড তৈরি করেও বিক্রি করতেন বাড়তি উপার্জনের জন্য। এছাড়াও স্থানীয় মেয়েদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিতেন।

পুরোনো বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন পর স্বামী-সন্তানসহ নতুন বাড়িতে ওঠেন তিনি। সেখানে ২০০৩ সালে একটি বিউটি পার্লার গড়ে তোলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার ব্যবসা জমে ওঠে; স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন জান্নাত। বাবার নামে তিনি নিজেই একটি বাসা নেন ২০০৫ সালে। সন্তানদের লেখাপড়াসহ সংসারের যাবতীয় ব্যয় জান্নাতকেই বহন করতে হতো। স্বামীও তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যদিও তার নির্যাতনের মাত্রা এরপরও কমে নি।

নিজেকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার জন্য জান্নাত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজম্যন্ট' থেকে ২০০০ সালের জুলাই মাসে নেয়া সুপারভাইজারি স্কিল এন্ড লিডারশীপ ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, ২০০৪ সালে যুব উন্নয়ন থেকে নেয়া নেতৃত্ব বিকাশ এবং কারিতাস চট্টগ্রাম থেকে ২০০৭ সালে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ও বিজনেস একাউন্টস-এর ওপর নেয়া বিশেষ প্রশিক্ষণ।

'নারী ঐক্য বাংলাদেশ'-এর গড়ে ওঠা

আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে জান্নাতের সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'চিটাগাং সোসাল ডেভেলপমেন্ট ফোরাম' অনুরূপ একটি সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এবং উজ্জীবক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারেন। প্রশিক্ষণের প্রতিই পূর্ব থেকেই জান্নাতের দুর্বলতা ছিল। কারণ এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তিনি এগিয়ে যেতে পেরেছেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম কারিতাস ভবনে অনুষ্ঠেয় ৬৩৩ তম ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জান্নাত পূর্ব থেকেই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যে কাজ শুরু করলেও এই প্রশিক্ষণটি তার আত্মবিশ্বাসকে আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে এবং তিনি নব উদ্যোমে পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করেন।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যে জান্নাত সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের সংগঠিত করতে গড়ে তোলেন 'নারী ঐক্য বাংলাদেশ'। ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য ৫০ জন নারীর সমন্বয়ে গঠিত এই সংগঠন বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। শুরুতে বিনামূল্যেই জান্নাত দুঃস্থ নারীদের প্রশিক্ষণ দেন। পরে ২০০৬ সালে নামমাত্র মূল্যে সেলাই, ব্লক-বাটিক, এবং বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেন। বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণের কোর্স ফি অনেকে কিস্তির মাধ্যমে আবার অনেকে কাজ শিখে আয় করেও পরিশোধ করেন।

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫০০। তারা সামর্থ্য অনুযায়ী দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিকভিত্তিতে সঞ্চয় করে থাকেন। সদস্যদের সঞ্চিত অর্থে সংস্থার মূলধন দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা, যা ব্যবহৃত হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে। দুঃস্থ মানুষের সুবিধার্থে মাত্র ১২.৫% সরল সুদে এই ঋণ দেয়া হয়।

জান্নাত অবহেলিত নারীদের ভাগ্যোন্নয়নে ভাগ্য উন্নয়নে নিয়োজিত এক নিবেদিত প্রাণ। ইতোমধ্যে নারী নেতৃত্ব বিকাশ ফাউন্ডেশন কোর্সের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়ে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। গার্মেন্টস কর্মীদের বেতন ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা এর মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও কোনো নারী পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত হলে তা প্রতিরোধ বা প্রতিকারের উদ্যোগ নিতে জান্নাত সদা সচেষ্ট। সম্প্রতি ঘটে যায় এমন একটি ঘটনা। নোয়াখালীর মেয়ে মুন্নী শহরের একটি গার্মেন্টসে কর্মরত অবস্থায় প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তারই সহকর্মী জসিমের সাথে। পরবর্তীতে সে গর্ভবতী হয়ে পড়লে জসিম বিয়ে করতে অস্বীকার করে। বিষয়টি জানতে পেরে জান্নাত ছেলেটিকে আটক করে এবং তার উদ্যোগে উভয় পরিবারের সম্মতিতে মুন্নী ও জসিমের বিয়ে হয়।

<u>জান্নাতের স্বপ্ন</u>

জান্নাত স্বপ্ন দেখেন তার দুই সন্তান উচ্চ শিক্ষিত হবে। তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ না করলেও তিনি চান তারা আত্মসচেতন নাগরিক হিসেবে সমাজে অবদান রাখবে। তবে জান্নাতের স্বপ্ন শুধু তার পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি গোটা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখেন। এ স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দেয়ার লক্ষ্যে বঞ্চিত মানুষদের তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই তার ব্রত। আর সে লক্ষেই এগিয়ে চলেছে জান্নাতের জয়যাত্রা।

ষোল টাকার বানু মেম্বার

তুহিন আফসারী

প্রতিদিন সকালে বাড়ির সামনে মানুষের ভীড় আর কোলাহল লেগেই থাকেন। কারো ঘরের সমস্যা, কারো একান্তই নিজের কথা; আবার কারো কারো সাহায্য অথবা পরামর্শ দরকার। এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের উপস্থিতি বাড়ির মানুষের কাছে বর্তমানে অতি পরিচিত একটি বিষয়। প্রথমদিকে বাড়ির সদস্যরা কিছুটা বিরক্ত বোধ করলেও এখন সকলেই বিষয়টির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। যার জন্য বাড়ির সামনে এত মানুষের আগমন আর কোলাহল তিনি হলেন লাইলা আরজুমান্দ বানু। ইউনিয়নে সবার পরিচিত বানু মেম্বার। মেহেরপুর জেলার গাংনী থানা সদর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরের একটি ইউনিয়নের চিত্র এটি। এই চিত্র আমাদের মনে এক ধরনের সুখস্মৃতির জন্ম দেয়। মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও এই দৃশ্য ছিল বিরল। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে, ফলে দেশও এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

ষোল টাকা। মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার একটি ইউনিয়নের নাম। এই ইউনিয়নে রহিম বক্স মণ্ডল ও আনোয়ারা বেগম দম্পতির বসবাস। আর্থিকভাবে সচ্ছল এই দম্পতির রয়েছে চার কন্যাসন্তান। পরিবারের সবচেয়ে ছোট সন্তানটির নাম লাইলা আরজুমান্দ বানু। সাধারণত পরিবারের ছোট সন্তানরা একটু আদরেই বড় হয়। বানুর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। বরং বাবা মায়ের বেশি আদরের কারণে তার শৈশব কেটেছে চঞ্চলতা আর দুরন্তপনায়। খেলাধুলা, পড়াশোনা আর দুষ্টমিতে দিন কেটে যেতো। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কারণে বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ হয়েছে অনেকবার।

রহিম বক্স মণ্ডল তার চার কন্যাকেই উচ্চ শিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন পূরণের জন্য তিনি সকলের লেখা-পড়ার দিকে কড়া নজর রাখতেন। কিন্তু হঠাৎ করেই বানুর বড় বোন এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে রহিম বক্স মণ্ডল তার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এবং ছোট মেয়ে বানুর লেখা-পড়া বন্ধ করে দেন। পরিবারের এরূপ হটকারি সিদ্ধান্তের কারণে বানুর জীবন থেকে মূল্যবান দুটি বছর হারিয়ে যায়। এক পর্যায়ে বাবার অজান্তে গোপনে লেখাপড়া শুরু করেন বানু। বন্ধুদের সহযোগিতা আর নিজের প্রবল আগ্রহের কারণে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেন। বিষয়টি জানার পর রহিম বক্স মণ্ডল পুনরায় মেয়ের লেখা-পড়ার প্রতি নজর দেন।

১৯৮৩ সাল বানুর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছর তিনি এসএসসি পাশের মাধ্যমে বাবা-মায়ের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ করলেও পরিবারের অমতে একজন বেকার ছেলেকে বিয়ের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্নে গুড়ে বালি ঢেলে দেন। একই গ্রামের অনার্স পড়ুয়া ছাত্র ওয়ালিউল আজম ও বানু উভয় পরিবারের অমতে পালিয়ে বিয়ে করেন। দুই পরিবারের কেউ এই বিয়ে মেনে নেয় নি। ফলে প্রায় তিন মাস নব-দম্পতিকে একরকম লুকিয়ে থাকতে হয়।

তিন মাস পর এলাকার বাসিন্দা ও নিকটাত্মীয়দের সহায়তায় শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতে পারলেও প্রথম রাত থেকেই শুরু হয় আলাদা সংসার। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে লেখা-পড়া করার কারণে চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েন তারা। তবে দুর্বিষহ এই জীবন তাদের বেশি দিন থাকে নি। ১৯৮৪ সালে অনার্স পাশ করার পর পরই ওয়ালিউল আজম একটি চাকরি পান। স্বামীর চাকরি আর শ্বশুরের দেওয়া সামান্য জমি দিয়ে বেশ ভালোভাবেই কেটে যেতে থাকে তাদের সংসার। এভাবে প্রাথমিক ধাক্কা সামলিয়ে স্বাভাবিক দিন যাপনের চেষ্টা চলতে থাকে বানুদের। এরই মধ্যে স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠানে বানুর চাকরি হয়।

তবে তাদের দুর্দিনে ছাট দেবর সেলিম আজাদ মনু সর্বদাই তাদের পাশে থেকে সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন বলে বানু জানান।

কথায় আছে 'তেলে মাথায় সকলেই তেল দেয়, আর সুসময়ে সকলেই কাছে আসে।' বানুর জীবনেও এই প্রবাদের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নি। দুঃসময়ে কেউ পাশে না এলেও চাকরি পাওয়ার পর সকলেই কাছে আসে। বিভিন্ন রকম উপদেশ দিতে শুরু করে। আর এই উপদেশই বানুর জীবনকে পুনরায় বিষাদময় করে তোলে। ঘরের বউ ঘরেই থাকবে, সে চাকরি করলে বংশের সুনাম ধ্বংস হবে, পর্দাহীনতার কারণে গজব নেমে আসবে– ইত্যাদি কথাগুলো নিকটাত্মীয় ও পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আসতে শুরু করে। ঘরের বউ ঘরের বাইরে গেলে ইজ্জত চলে যাবে– এই অজুহাতে শ্বশুরবাড়ির সকলেই অসহযোগিতা করতে শুরু করে বানুকে। এই দুঃসময়ে স্বামীর আচরণও অনেকটা রহস্যজনক হয়ে ওঠ। তাকে যেনো দূরের মানুষ মনে হতে থাকে। এ করকম একা পড়েন তিনি। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৭ সালে চাকরি চেড়ে দিতে বাধ্য হন।

চাকরি ছাড়ার পর ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও কেবলমাত্র ঘর-সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হত বানুকে। এভাবে কেটে যেতে থাকে সময়। এক পর্যায়ে নিজেকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা শুরু হয় তার মনে। মনে হতে থাকে তার মত কোনো নারীকে এরূপ যন্ত্রণা যেন কোনো দিন সহ্য করতে না হয়। চাকরি ছাড়ার পর থেকেই গ্রামের মানুষদের সাথে বেশ সখ্যতা গড়ে ওঠে বানুর। পাড়ার যে কারো কোনো সমস্যা হলেই বানু ছুটে যেতেন সেখানে। ফলে এলাকার মানুষের সাথে তার একটি যোগসূত্রতা সৃষ্টি হয় এবং ক্রমান্বয়ে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকে। ১৯৯৮ সালে পারিবারিক প্রয়োজনে গ্রাম থেকে শহরে এসে বসবাস শুরু করলেও গ্রামে যাওয়া থেমে থাকে নি। এলাকার মানুষের কোন সমস্যার কথা শুনলেই ছুটে যেতেন সেখানে। এভাবে এলাকার মানুষের সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে বানুর। ২০০০ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে এলাকার মানুষের প্রবল আগ্রহ ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি এবং বিপুল ভোটের ব্যবধানে ষোল টাকা ইউনিয়নের সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর থেকেই লাইলা আরজুমান্দ বানু 'ষোল টাকার বানু মেম্বার' হিসেবে পরিচিত হতে থাকেন।

এভাবে একদিকে সংসার আর অন্যদিকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ– এটিই হয়ে ওঠে বানুর দিনপঞ্জি। ২০০৬ সালে তিনি গাংনীর উজ্জীবক সৈয়দ জাকির হোসেনের কাছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও উজ্জীবকদের স্বেচ্ছাব্রতী কাজ সম্পর্কে জানতে পারেন। বিষয়টি তাকে আকৃষ্ট করে এবং উজ্জীবক প্রশিক্ষণের অপেক্ষায় থাকেন। ২০০৬ সালে ১১৫৭তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন বানু মেম্বার। প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন, স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রভৃতি পর্বগুলো তাকে বেশ আকৃষ্ট করে।

প্রশিক্ষণের পর এক ধরণের নতুন উপলব্ধি সৃষ্টি হয় বানুর মধ্যে। এই উপলব্ধি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এই প্রশিক্ষণ যদি আরো আগে পেতাম তাহলে আমার জীবনের উন্নতি আরো বেশি হত, আরো বেশি মানুষকে সফল হতে সহায়তা করতে পারতাম। মূলত এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমার মধ্যে নব চেতনার জন্ম হয়। প্রশিক্ষণ শেষে বানু নতুন উদ্যোমে কাজ শুরু করেন। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন প্রভৃতি বিষয়ে কাজ শুরু করেন তিনি। ২০০৭ সালে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্স গ্রহণ করেন বানু। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ফলে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে তার গতি বৃদ্ধি পায়। নারীদের আত্মনির্ভরশীল ও তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারীদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'ষোল টাকা মানব উন্নয়ন সংস্থা' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা মাসিক পাঁচ টাকা হারে সঞ্চয় জমা করেন। সঞ্চিত টাকা নিজেদের মধ্যে ঋণ হিসেবে স্বল্প সুদে বিতরণ করা হয়। বর্তমানে তাদের মূলধন প্রায় দশ হাজার টাকা।

প্রশিক্ষণের পর বানু ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে জনগণের অংশগ্রহণকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনানুসারে ওয়ার্ড ও পাড়াভিত্তিক কমিটি গঠন করে কমিটিগুলোর দ্বারা নিয়মিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সকল প্রকার নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুককের কুফল, স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম শুরু করেন। ফলে দ্রুত গতিতে ষোল টাকা ইউনিয়নে গণ কেন্দ্রিক উন্নয়ন সাধিত হতে থাকে। বর্তমানে ষোল টাকা ইউনিয়নে কোনো বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটে না এবং প্রকাশ্যে কোনো যৌতুকের লেন-দেনও হয় না। এছাড়া নারী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে কয়েক কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে শতভাগ শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা হয় এবং রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনো বিবাহের ঘটনা ঘটে না।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বানু আজ অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। বানুর বিশ্বাস, তার এই পরিশ্রম বৃথা যাবে না। আমাদেরও উচিত প্রত্যন্ত পল্লীর এই নারীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাজ করে যাওয়া। যার মাধ্যমে সৃষ্টি হবে একটি নিরাপদ ও বৈষম্যহীন সমাজ। যেখানে নারী-পুরুষ সকলের সমান অধিকার থাকবে। যেখানে ইয়াসমীনের ন্যায় কোনো কিশোরীকে প্রাণ দিতে হবে না। আত্ম হননের পথ বেছে নিতে হবে না সিমি, তৃষা, রুমির ন্যায় আর কাউকে।

সাধারণ পরিবারের অসাধারণ দিপু

সৈয়দ সেলিনা শিরিন

অসংখ্য ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইটে ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর ওসমানী মিলনায়তনে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল একটি মুখ। সারা দেশের অগণিত টিভি দর্শক সেদিন যাকে পর্দায় দেখেছিলেন জাতীয় যুব পুরুস্কার বিজয়ী হিসেবে। সাংবাদিকরা যার মুখের কথা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিল। তিনি হলেন রোখসানা পারভীন দিপু। কিন্তু আজকের এই দিপুর জীবন চলার পথটি মোটেও সহজ ছিল না। জীবন সংগ্রামের অনেক চড়াই উৎরাই পেড়িয়েই আজকের এই সফলতা।

ভোলা জেলার দৌলতখান থানার বড় ধলি গ্রামের একটি সাধারণ পরিবারে ১৯৮৩ সালে দিপুর জন্ম। বাবা ছিলেন বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কৃষি জমি এবং বাবার চাকরির আয় দিয়ে ভালোই চলছিল তাদের সংসার। বাবা-মা, ভাই-বোন ছাড়াও চাচা-চাচী ও দাদাকে নিয়ে ছিল তাদের যৌথ পরিবার। কিন্তু ১৯৮৮ সালে হঠাৎ করেই বাবার মৃত্যুর পর তাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। দিপুর মাতৃপক্ষ আর্থিকভাবে খুব একটা সচ্ছল ছিল না। বাবার মৃত্যুর পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে দিপুর দাদা তার মাকে একরকম বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে সন্তানদের রেখে বাবার বাড়ি ফিরে যায় তার মা। দিপুর বড় ভাই কবির ভুঁঞা সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিল। দিপুসহ পাঁচ ভাই-বোনের কাছে এই বড় ভাইটিই ছিল একমাত্র ভরসা। আর ক'দিন পরই পড়ালেখা শেষ করে সংসারের হাল ধরবে এমনটিই আশা ছিল সকলের। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস! মাত্র তিন মাসের মধ্যে আরেকটি দুর্ঘটনা কবিরের সম্ভাবনাময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। পিজি হাসপাতালের সামনে একটি গাড়ির ধাক্কায় নিভে যায় কবিরের জীবন প্রদীপ।

বাবা ও বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর অনাথ চার ভাই-বোন ক্রমেই দিপুর দাদা ও চাচাদের কাছে বোঝা সমতুল্য হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত চাচা ও মামারা মিলে চার ভাই-বোনকে ভাগ করে নেন। তবে শর্ত থাকে যে দাদার কাছে দিপুদের ভাগের যে সম্পত্তি আছে সন্তান লালন-পালনের জন্য তারা এগুলো ভোগ করবে। ছোটভাইসহ দিপু যে চাচার ভাগে পড়লেন তিনি ঢাকার মানিকদি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বসবাস করতেন। চাচা ফয়েজ আহম্মেদ মানিকদি ক্যান্টনমেন্টে ওয়ারেন্ট অফিসার পদে চাকুরি করতেন।

চাচা-চাচীর আশ্রয়ে এসে দিপু ও তার ছোট ভাই নতুন এক নির্মমতার মুখোমুখি হন। চাচার বাড়ি থেকে কাজের লোকদের বিদায় করে দেয়া হয়। ফলে বাড়ির যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্ব বর্তায় অনাথ এই শিশু দুটির ওপর। এ ভাবে দুই বছর কেটে যায়। লেখা-পড়ার পরিবর্তে একরকম গৃহভৃত্যের কাজ করতে থাকে বাবা-মা হারা এই দুই ভাই-বোন।

১৯৯১ সালে দিপুর বড় বোন ঢাকায় এসে ছোট ভাই-বোনের এই দুরাবস্থার কারণ সম্পর্কে চাচাকে প্রশ্ন করেন। শেষ পর্যন্ত দিপুর চাচা দিপুকে মানিকদি আদর্শ বিদ্যা নিকেতনে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। স্কুলে ভর্তি হলেও লেখাপড়ার

সুযোগ দিপু কোন সময়ই পেত না। সংসারের বিভিন্ন ধরণের কাজ নিয়েই তাকে সারা দিন ব্যস্ত থাকতে হত। এর পরও নিয়মিতভাবে চাচীর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হতো।

১৯৯১ সালে রমজান মাসের এক রাতে ভাত কম হওয়ায় দিপুর ছোট ভাই কান্না শুরু করে এবং না খেয়েই রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে সকালে ক্ষুধার জ্বালায় সে পুনরায় কান্না শুরু করলেও চাচী তার জন্য কোন খাবার ব্যবস্থা করেন নি। দুপুর ১২ টার দিকে চাচী খাবারের জন্য ছোট এই বাচ্চাটিকে গোসল করে আসতে বলে। শুধুমাত্র এক মুঠো খাবারের আশায় অভুক্ত শিশুটি বাড়ির পাশের ঝিলে গোসল করতে যায়। দিপু জানত তার চাচী হয়ত তাকে সারাদিন খাবার দেবে না। তাই সে তার ভাগের ভোরের খাবারটুকু পানি দিয়ে পান্তা করে রেখেছিল দুপুরে ছোট ভাইকে খেতে দেওয়ার জন্য। চাচীর মাধ্যমে জানার পর দিপু তার হাতের কাজ শেষ করে ছোট ভাইয়ের জন্য খাবাব নিয়ে অপেক্ষা করছিল। গোসল শেষে ছোট ভাই ফিরে এলেই তাকে খাবারটুকু দিয়ে তার কান্না থামাবে। কিন্তু মিনিটের পর ঘণ্টা পার হয়ে যায় ছোট ভাই বাহার আর আসে না। প্রায় দু ঘন্টা পর বাড়ির কাজ শেষে দিপু ছোট ভাইয়ের খোঁজে ঝিলের দিকে যেতেই দেখেন তার চাচা কোলে করে ছোট ভাইয়ের লাশ নিয়ে আসছে। কান্না জড়িত কণ্ঠে দিপু বলেন 'চাচার কোলে দেখি বাহার ঘুমিয়ে আছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি যে ও পানিতে ডুবে মারা গেছে। ভেবেছিলাম ক্ষুধার যন্ত্রণায় হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু কাছে যেতেই দেখি ওর মুখটি কেমন যেনো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চাচা জানালো ও পানিতে ডুবে মারা গেছে। দিপুর আজও মনে হয়, বাহার তখনো বেঁচে ছিল। সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করলে হয়তো বাহার বেঁচে যেত। কিন্তু তার চাচা-চাচী অযথাই কিছু সময় নষ্ট করে বাহারের দাফনের ব্যবস্থা করে। বাহারের মৃত্যু খবর জানার পর দিপুর মা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং এখনও তিনি পাগল।

এভাবে সময় এগিয়ে চলে এবং চাচীর নির্যাতনে দিপুও জর্জরিত হতে থাকেন। সারাদিন হারভাঙ্গা পরিশ্রম করার পরও চাচীকে সন্তুষ্ট করা ছিল দুরূহ। লেখাপড়ার জন্য কোন সময়ই পেতেন না তিনি। তাই সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাতে লেখা-পড়া করতেন। এমনকি কাজ কম হলে চাচী রেগে গিয়ে বই খাতা ছিড়ে ফেলতেন। তাই বই খাতাগুলোও সবসময় বাড়ির মুরগীর খামারের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হত।

দিপু কখনোই নিয়মিত স্কুলে যেতে পারতননা। যে কদিন স্কুলে যেতেন সেটাও বিলম্বিত হত। মূলত বাড়ির কাজ শেষ করে তার পক্ষে স্কুলে যাওয়া ছিল ভীষণ কষ্টের। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে স্কুলের শিক্ষকরা দিপুকে অনেক সহযোগিতা করেন। এমনকি দিপুর পড়ালেখা যেন বন্ধ না হয় সে জন্য তারা দিপুর চাচা-চাচীর সাথে দেখাও করেন। এ সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও দিপু পরীক্ষায় সবসময় ভালো রেজাল্ট করতো। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায় দিপু। ১৯৯৭ সালে দিপু মানিকদি আদর্শ বিদ্যা নিকেতন থেকে স্টার মার্কস পেয়ে প্রথম শ্রেণিতে এসএসসি পাশ করেন।

এসএসসি পরীক্ষার শেষ দিনটি ছিল দিপুর জীবনের আরও একটি বেদনার দিন। সেদিন পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে দেখেন চাচা-চাচী তার বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাকে দ্রুত প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। কারণ বরপক্ষ চলে আসবে। অনেক আকুতি-মিনতি করার পরও দিপুর কথা কেউ শোনে নি। সন্ধ্যা নামার পূর্বেই কোনোরকম মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই বিয়ে হয়ে যায় তার। বিয়ের পর তিনি জানতে পারেন, স্বামী একটি বেসরকারি সংস্থার গাড়ি চালক পদে চাকরি করে। বিয়ে করেই তিনি দিপুকে নিয়ে চলে আসেন ঢাকার মিরপুরের ভাড়া বাসাতে। এখানে শুরু হয় দিপুর নতুন জীবনের আর এক নতুন অধ্যায়।

স্বামীর বাড়ি আসার পর নতুন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হন দিপু। কয়েক দিন যেতে না যেতেই স্বামী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় তাকে। এভাবেই কেটে যায় কিছুদিন। বিষয়গুলো নিয়ে দিপু তার প্রতিবেশীদের সাথে আলাপ করলে প্রতিবেশীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় ১৯৯৮ সালে তিনি যুব উন্নয়নের হস্ত শিল্প বিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে তার দক্ষতা দেখে যুব উন্নয়নের কর্মকর্তাগণ সন্তোষ্ট হয়ে তাকে তাদের মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। এরপর যুব উন্নয়নের পক্ষ থেকে দিপু ব্যাচের পর ব্যাচ প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন।

প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দিপুর হাতে বেশ কিছু অর্থ জমা হয়। স্বামীর সাথে আলোচনা করে তিনি মিরপুর বাংলা কলেজে ভর্তি হন এবং ২০০০ সালে প্রথম শ্রেণিতে এইচএসসি পাশ করেন তিনি। লেখাপড়া ও যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে গিয়ে দিপুর সাথে সমাজের অনেকের পরিচিয় ঘটে। মিলি যাকারিয়া এদের মধ্যে অন্যতম। তিনি দিপুর সকল ঘটনা জানতেন এবং সাধ্যমত পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতেন। ২০০০ সালে মিলি যাকারিয়া দিপুর হাতে একটি ফরম দিয়ে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরামর্শ দেন। ১২৫তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণ সম্পর্কে দিপু বলেন, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জন্ম নেয়। প্রশিক্ষণে উপস্থিত বিভিন্ন জনের জীবনের গল্প শুনে মনে হয় চেষ্টা করলে অবশ্যই আমি এগিয়ে যেতে পারবো। তিনি আরো বলেন, প্রশিক্ষণের শেষ দিন মনে মনে আমি উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। এছাড়া 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনোও দরিদ্র থাকতে পারে না'– এই শ্লোগানটি আমাকে আরো বেশি আত্মশক্তিতে বলীয়ান করেছে।

দিপুর এরপরের গল্পটুকু শুধুই সফলতা ও সামনের দিকে এগিয়ে চলার। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি পূর্বের কলেজে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন এই কলেজ থেকেই যথাক্রমে ২০০২ সালে স্নাতক এবং ২০০৬ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া যুব উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজকে আরো সুন্দর ও গুছিয়ে শুরু করেন। ইতোমধ্যে প্রায় ত্রিশ হাজারেরও অধিক নারীকে আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তিনি। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অনেকেই এই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে আজ স্বাবলম্বী হয়েছেন। বর্তমানে দিপুর তত্ত্বাবধানে ৮০০ মেয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

এ সকল কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ২০০৭ সালের পহেলা নভেম্বর ওসমানী মিলনায়তনে দিপুকে জাতীয় যুব পুরুস্কার প্রদান করে। শুধু তাই নয়, একই বছরের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে হিউম্যান রাইটস সোসাইটি প্রশিক্ষণে পারদর্শিতা ও ত্রিশ হাজার নারীকে কর্মময় করে তোলার জন্য তাকে স্বর্ণপদক প্রদান করে।

হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে মিরপুরের ৬ নং সেকশনে ১০ জন নারীকে সাথে নিয়ে দিপু আড়াই কাঠা জায়গা কিনে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন। নারীদের স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে এখানে তিনি একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। রান্না, সেলাই, পার্লার, গিফট আইটেমসহ ১৫০টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এখান থেকে উৎপাদিত পণ্যসমূহ দেশের পাশাপাশি দেশের বাইরেও বিশেষ করে ফ্রান্স, থাইল্যান্ডের বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছে।

ভাতের অভাবে নিজ ভাইয়ের করুণ মৃত্যু দিপুকে এখনো কাঁদায়। এজন্য তিনি দেশের অনাথ ছেলেমেয়েদের উন্নয়নে কাজ করতে আগ্রহী। ইতোমধ্যে সে লক্ষ্যে এগিয়েও চলেছেন। সাভারে দশ কাঠা জায়গা কিনেছেন। ভবিষ্যতে যেখানে তিনতলা ভবন নির্মান করে দ্বিতীয় তলায় একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করবেন। তৃতীয় তলা হবে বৃদ্ধ আশ্রম। এছাড়া নীচ তলায় মার্কেট গড়ে তোলা হবে যায় আয় দিয়ে এতিমখানা ও বৃদ্ধ আশ্রমটি পরিচালিত হবে। দিপু তার সকল ব্যাংক হিসাব ও সঞ্চয়ে এতিমখানাকে নমিনি করেছেন। আর এতিমখানাটি উৎসর্গ করবেন তার ভাই বাহারের নামে। যে এক মুঠো ভাত না পেয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য।

প্রচেষ্টা আর আত্মবিশ্বাস যে মানুষকে বদলে দিতে পারে তার অন্যতম উদাহরণ রোখসানা পারভীন দিপু। বাবার মৃত্যুর পর যে মেয়েটি চাচা-চাচীর কাছে গৃহদাসী এবং এসএসসি পরীক্ষার শেষ দিন যাকে একজন গাড়ী চালকের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, শুধু নিজের প্রচেষ্টা আর আত্মবিশ্বাসকে নির্ভর করে আজ স্বনির্ভর। তার বর্তমানে গড় মাসিক আয় প্রায় ২৫,০০০ টাকা। ইতোমধ্যে ঢাকা শহরে গড়ে তুলেছেন একটি মাথা গোজার ঠাঁই। শুধু নিজের উন্নয়নেই তিনি মগ্ন থাকেন নি, আত্মনির্ভরশীল করেছেন হাজার হাজার দুঃস্থ অসহায় নারীকে। এখানেই থেমে থাকতে চান না তিনি। দেশের নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য যেতে চান নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে। এ লক্ষ্যে বিসিএস পরীক্ষা দিচ্ছেন। দিপুর যে মনোবল তাতে এই পরীক্ষাও হয়ত তিনি সহজেই পেরিয়ে যাবেন। পূরণ করবেন তার সুপ্ত বাসনা।

দিপু নারী জাতির জন্য দৃষ্টান্ত। অনুকরণীয় মডেল। দেশের নারীরা যদি দিপুর মত জেগে ওঠে, এগিয়ে যায় সামনের দিকে তবে হয়ত এদেশ থেকে নারীর অধস্তন অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটবে। দিপুর মত আমাদেরও প্রত্যাশা, নারীরা এগিয়ে চলুক সামনের দিকে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গড়ে উঠুক নতুন বাংলাদেশ।

জীবন যুদ্ধে জয়ীঃ ফজিলাতুন নাহার

সুব্রত কুমার পাল

“মায়ের মৃত্যুর সময় ছোট ছিলাম। ছয় বছর বয়সে কিছুই বুঝতে পারি নি। সুশ্রী ছিলাম বলে তড়িৎ বিয়ে দেয়ার তাগিদ ছিল পরিবার থেকে। যখন আমার পুতুল খেলার বয়স, সহপাঠীদের সাথে স্কুলে যাওয়ার সময়; ঠিক তখই ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে খেলার আঙ্গিনা থেকে উঠে বধূবেশ ধারণ করতে হয়। ফুফাতো ভাই ব্যবসায়ী মোঃ জহুরুল আলমের বউ হয়ে ঢাকা থেকে চলে আসতে হয় রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার নন্দনগাছিতে”- কথাগুলো বলছিলেন জীবন যুদ্ধে জয়ী ফজিলাতুন নাহার।

পরিবারে ছয় ভাই দুই বোনের মধ্যে সবার ছোট ফজিলাতুন নাহার। সবার ছোট বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মধ্যে বেড়ে ওঠার শৈশব ছিল তার। কোনো বিষয়ে প্রতিবাদের ভাষা ছিল না। মুখ বুঝে মেনে নিতে নিতে এক ধরনের অভ্যস্ততা তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে। ফলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় বাল্যবিবাহের সাথে নেমে আসে ভাগ্য বিপর্যয়ও।

ফজিলাতুন নাহারের জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছেন। কিন্তু তিনি তার অতীতকে ভুলেন নি কখনো। শুরু হয় নতুন জীবনের পথ চলা। বিয়ের পর আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করেন। বেড়ে যায় তার আত্মবিশ্বাস। জীবনে আরো বড় হতে হবে, সফলও হতে হবে– এই প্রত্যাশা ছিল তার মধ্যে। স্বামী মোঃ জহুরুল আলমের সহযোগিতায় ফজিলাতুন নাহার ১৯৮৭ সালে এসএসসি পাশ করেন। সংসার, সন্তান এবং পড়াশুনা সবই চলতে থাকে সমান তালে। বেশ কিছুটা সময় তার সংসারে ব্যয় হত। ফলে ছেদ পড়ে পড়াশুনায়। কিন্তু তাতে থেমে যান নি। জীবনের সাথে যুদ্ধ করে সফলতা অর্জনের প্রত্যাশায় দীর্ঘ বিরতির পর এইচএসসি, ডিগ্রি এবং বিএড কোর্স সমাপ্ত করেন। বাড়ে মনের জোর। বর্তমানে তিনি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, রাজশাহীতে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখাপড়া করছেন। নিজের সাথে তিন কন্যার উচ্চ শিক্ষার বিষয়েও অত্যন্ত সচেতন তিনি। কন্যাদের পরিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে চান। বড় মেয়ে এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স, দ্বিতীয় মেয়ে গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে অনার্স পর্যায়ে অধ্যয়নরত। আর ছোট মেয়ে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষার্থী। তার প্রত্যাশা তিন মেয়েই মানুষের মতো মানুষ হয়ে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এমন করেই তাদের গড়ে তুলছেন বলে জানালেন ফজিলাতুন নাহার।

শুধু ঘর নয় সমাজকেও আলোকিত করার মানসিকতা ছিল ফজিলাতুন নাহারের। বর্তমানে তিনি নন্দনগাছি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৯৯ সাল থেকে স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত। সেই সুবাদে পরিচয় ঘটে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের স্বেচ্ছব্রতী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে। বিষয়টি তাকে আকৃষ্ট করে। ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের সাথে সম্পৃক্ত থেকে তার স্কুলের শিক্ষার্থীরা সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান, বাল্যবিবাহ

রোধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ প্রভৃতি সমাজসেবামূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। কাজগুলো তাকেও কাছে টানত। কাজের মধ্য দিয়ে ফজিলাতুন নাহার তার শৈশবকে আবারো এদের ভীড়ে খুঁজে পান। ভাবেন, শৈশবে এদের মত এত সচেতন হলে নিশ্চয় বাল্যবিবাহের শিকার হতে হত না। নানামুখী কার্যক্রমই ফজিলাতুন নাহারকে জাগিয়ে তোলে। তিনি তার এলাকায় সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন।

নিজ জীবনে ঘটে যাওয়া বাল্যবিবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু করেন এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আন্দোলন। কিন্তু কাজের সুনির্দিষ্ট কোনো কৌশল তার জানা ছিল না। তাই কেমন যেন একটু বিক্ষিপ্ততা ছিল তার মাঝে। সুযোগ আসে রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অনুষ্ঠিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের উদ্যোগে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের। ২০০৭ সালের মে মাসে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনের এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ফলে তার চিন্তা চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। কাজের ধরন ও কৌশল সম্পর্কে জানতে পারেন। পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পায়।

যখন তিনি জনপ্রতিনিধি

শিক্ষকতার পাশাপাশি এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করছেন ফজিলাতুন নাহার। তিনি যখন ডিগ্রি শ্রেণির শিক্ষার্থী তখন এলাকাবাসী তার কর্ম উদ্দীপনা, দৃঢ় মনোবল আর আত্মবিশ্বাস দেখে তাকে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে তিনি নিমপাড়া ইউনিয়নের ৪, ৫, ও ৬ নং ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিপুল ভোটে জয়ী হন। দীর্ঘ পাঁচ বছর এলাকার নানামুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাস্থ্য কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে নিমপাড়ায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেন। শিশুদের জন্য ছয়টি অত্যাবশকীয় টিকা প্রদান নিশ্চিত করেন। এছাড়া বয়স্ক শিক্ষাসহ এলাকায় সচেতনতামূলক কাজগুলো করার ফলে তার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। গ্রামে আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করেছেন। ঝরে পড়া শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ফলে এলাকায় শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

এলাকায় জনপ্রতিনিধি হিসেবে ফজিলাতুন নাহারের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা। তিনি তার স্কুলের তরুণ শিক্ষার্থীদের এ কাজে যুক্ত করেন। ফলে তার জন্য এগিয়ে চলা সহজ হয়। নিমপাড়া ইউনিয়নে একই দিনে তিনটি বাল্যবিবাহের খবর শুনে ফজিলাতুন নাহার তার স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। প্রথমে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হন এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের আলোচনা করেন। ফলাফল ইতিবাচক না হওয়ায় থানা প্রশাসনের সহায়তায় তিনটি বিয়েই বন্ধ করেন। শুধু বন্ধ নয়, বাল্যবিবাহ রোধ করার পর সেই কিশোরীদের করণীয় সম্পর্কে সময়োপযোগী সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন। নিজ উদ্যোগে তিনজনকেই নন্দনগাছি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। তাদের মধ্যে বর্তমানে একজন ডিগ্রি শ্রেণিতে অধ্যয়নরত, একজন নার্স হিসেবে রাজশাহী মেডিকেলে কর্মরত এবং অন্য একজন পুলিশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন চারঘাট থানায়। শুধু এই তিনজনই নয়, ফজিলাতুন নাহারের সহযোগিতায় অসংখ্য মেয়ে তাদের জীবনের শুরুতেই ঝড়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। ফিরে পেয়েছেন জীবনের

গতিপথ। জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাঁচ বছর সময় শেষ হয়ে গেলেও সংগ্রামী ফজিলাতুন নাহার তার কর্মকাণ্ডের নানামুখী পরিধি অব্যাবহ রেখেছেন।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে ক্যাম্পিং ও প্রচারণার মাধ্যমে নারীদের সামনে তুলে ধরেন জীবন বাস্তবতার নানা প্রতিচ্ছবি। পশ্চাৎপদ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার দেয়াল ভেঙ্গে নারীদের এগিয়ে চলার জন্য প্রয়োজন একাগ্রচিত্তে কাজ করা। আর এজন্য প্রয়োজন স্বাবলম্বী জীবন। ফজিলাতুন নাহার স্বপ্ন দেখেন, বাংলাদেশের আর কোনো নারী বাল্যবিবাহের শিকার হবেন না। স্বাবলম্বী হয়ে নিজেই কিছু করতে সক্ষম হবেন। আর তাই শিক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে তিনি নন্দনগাছি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টিকে কলেজে রূপান্তরিত করতে চান। এজন্য রয়েছে তার নিরন্তন চেষ্টা। ১৯৯৯ সালে নন্দনগাছী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে বিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্তন এনেছেন। এছাড়া শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র পাঠ্য-পুস্তকের জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; তা নয়। তাদের জানার পরিধিকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রতি ছুটির দিনে তাদের একত্রিত করে একসাথে বসে জনসচেতনতা বিষয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে তারা যেন আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীরা যেন শিক্ষাজীবন থেকেই কর্মমুখী হয়ে ওঠেন সে লক্ষ্যে তিনি স্কুলে কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছেন। একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফজিলাতুন নাহার দেখতে চান তার বিদ্যালয়টিকে।

স্বপ্ন এগিয়ে চলে

সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করতে না পারলে সুন্দর দেশ গঠন সম্ভব নয় বলে মনে করেন আদর্শ শিক্ষয়ত্রী ফজিলাতুন নাহার। জীবনের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে যুক্ত হয়েছেন চারঘাট উপজেলার দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাথে। কমিটিতে তিনি সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ আর সুন্দর দেশের স্বপ্নকার ফজিলাতুন নাহার তার কাজের মধ্য দিয়ে আলোকিত পথের সন্ধান পেয়েছেন বলে মনে করেন। 'নারীকে পশ্চাৎপদতা থেকে তুলে আনতে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের নানা কর্মকাণ্ডই আমাকে এ আলোর সন্ধান দিয়েছে। শ্রম, সাধনা আর আত্মবিশ্বাসের জোরেই জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়া সম্ভব'– বলছিলেন ফজিলাতুন নাহার। নারীরা ন্যায অধিকার ভোগ করবে, স্বাধীন ও স্বকীয়তা নিয়ে কাজ করবে এবং এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন রাজশাহীর চারঘাটের এই নারীনেত্রী।

আলোকিত গীতা ও অন্যান্যদের গল্প

কাজী ফাতেমা বর্নালী

বাড়িটি অনেক বড়। সচ্ছল পরিবার। কাজের লোকের অভাব নেই। এমন বাড়ির বধূ হিসেবে সবার মনই ভালো থাকার কথা। কিন্তু গীতার মন ভালো নেই। নিজেকে কেমন যেন জেলখানার বন্দী মনের হয়। স্বামী তেমন কোনো কাজ করেন না। একরকম বেকার বলা চলে। মুখে কেউ কিছু না বললেও বাড়ির সকলের তাকিয়ে থাকার ধরন ভালো লাগে না তার। এটি গীতার জীবনের অনেক পুরাতন দিনের চিত্র। বর্তমানে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। গীতা এখন একজন সফল নারীর নাম, যিনি শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে এগিয়ে গেছেন অনেক দূর। নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

গীতা রানীর জন্ম ১৯৬৬ সালে। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার জেলখালি গ্রামে। বাবা জিতেন্দ্র নাথ রপ্তান পেশায় চিকিৎসক। মা পুস্প রাণী রপ্তান ছিলেন গৃহিণী। পরিবারের প্রথম সন্তান গীতা শৈশব থেকেই ছিলেন দুরন্ত ও জেদী প্রকৃতির। বাবার সাথে গীতার ছিল দারুণ সখ্যতা। বাবাকে কেন্দ্র করেই তার সমস্ত আবদার আর দুষ্টমি আবর্তিত হত। শৈশবেই তিনি দেখেছেন পাক হানাদার বাহিনীর চরম নৃশংসতা। যুদ্ধের সেই ভয়াল স্মৃতি মনে হলে আজও গীতার শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। যুদ্ধের প্রথম দিকে পাকিস্তানী বাহিনী গীতাদের বাড়ি আক্রমণ করে। অবুঝ গীতা কিছু না বুঝেই ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাবার হাত ধরে ছিলেন। দখলদার বাহিনী নির্দয়ভাবে গীতার হাতে বাড়ি মেরে তার বাবাকে সেদিন ধরে নিয়ে যায়। তবে অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে যান ডা. জিতেন্দ্র নাথ রপ্তান। বাড়ি ফিরে সেদিন রাতেই তারা দেশান্তরী হন এবং ভারতে আশ্রয় নেন।

পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর পরই পরিবারের সকল সদস্যের সাথে গীতা দেশে ফিরেন এবং ১৯৭২ সালে জেলখালি মথিরাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে জেলখালি ত্রিপানী হাই স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকে এসএসসি পাশ করেন। এসএসসি পাশের পর পরই বাবা জিতেন্দ্র নাথ রপ্তান মেয়ের কোনো অনুমতি না নিয়েই নিজের পছন্দকৃত ছেলের সাথে বিয়ে দেন। শ্বশুরবাড়িতে অনেক ধন-সম্পদ থাকলেও স্বামী রজনী কান্ত বর্মন ছিলেন বেকার। বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে খরচ করাই ছিল তার মূল কাজ। প্রচুর অর্থ থাকলেও শ্বশুরবাড়ির লোকজন ছিলেন সঙ্কীর্ণ মানসিকতার। শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাদের তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। অনেক চেষ্টার পরও শুধুমাত্র স্বামীর অনিচ্ছার কারণে গীতা কলেজ জীবন শুরু করতে পারেন নি। কয়েক বছরের ব্যবধানে এক ছেলে ও এক মেয়ের জননী হন। বিয়ের এগারো বছর পর শ্বশুরের সম্পত্তি ভাগ বণ্টন করা হয়। পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া জমিতে চাষাবাদের পরিবর্তে পাড়ায় পাড়ায় টিউশনি শুরু করে রজনী কান্ত বর্মন। টিউশনি থেকে মাসে তিনশত টাকা আয় হত, যা তিনি ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খরচ বাবাদ ব্যয় করতেন। কিন্তু এত অল্প টাকায় সন্তানদের শিক্ষা খরচ নির্বাহ করা সম্ভব হত না। পাশাপাশি সংসারের অন্য খরচের বিষয়টি তো রয়েছেই। একদিকে আর্থিক সঙ্কট অন্যদিকে ঋণের বোঝা সংসারের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সংসারের আর্থিক সচ্ছলতার লক্ষ্যে চাকরি খুঁজতে শুরু করেন গীতা। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ঢাকা আহসানিয়া মিশনে শিক্ষক পদে সুযোগ পান। ৬০ জন শিশুকে নিয়ে মানিকখালী গ্রামে স্কুলটি শুরু হয়। দুই শিফটে ক্লাস করে মাসে সাতশত টাকা বেতন পেতেন। এক বছরের মধ্যে ভালো কাজের পুরুস্কার হিসেবে পদোন্নতি পান। মাসিক নয় শত টাকা বেতনে মডেল স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিন বছরের এই শিক্ষা প্রকল্প শেষ হয়ে গেলে গীতা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-হস্তশিল্প প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করতে থাকেন। এভাবে উপার্জিত অর্থ দিয়ে সংসার এবং ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালাতে থাকেন তিনি।

বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সাথে কাজ করার সুবাদে গীতার সাথে পরিচয় হয় রমজান নগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলমগীর হায়দারের সাথে। তার মাধ্যমে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এবং উজ্জীবকদের বিভিন্ন স্বেচ্ছাব্রতী কার্যক্রম সম্পর্কে

জানতে পারেন। বিষয়টি তার মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং ২০০১ সালে শ্যামনগর ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ৬২তম ব্যাচ উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন, নয় বিন্দুর খেলা, স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রভৃতি পর্বগুলো তার ভীষণ ভালো লাগে। গীতা বলেন, প্রশিক্ষণের পূর্বে যে কোনো কাজ শুরুর পূর্বে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করার কারণে মনে হত আমাকে দিয়ে বুঝি এই কাজ হবে না। সব সময় একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতাম। কিন্তু প্রশিক্ষণের পর এই দ্বিধা কেটে যায়, মনে হতে থাকে, নারী নয় আমি একজন মানুষ। সুতরাং যে কোনো কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব। প্রশিক্ষণের এই আত্মবিশ্বাসই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে তিনি দুই হাজার টাকা ব্যয় করে বাড়িতে হাঁস-মুরগী পালন শুরু করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে হাঁস-মুরগীগুলো বড় হয় এবং তারা ডিম দিতে শুরু করে। ক্রমান্বয়ে তার পুঁজি বাড়তে থাকে। বর্তমানে তিনি এই হাঁস-মুরগী পালন প্রকল্প থেকে বছরে প্রায় তিন হাজার টাকা আয় করেন। হাঁস-মুরগী প্রকল্প সফল হওয়ার পর তিনি একই ইউনিয়নের ঋষি পাড়ায় একটি সবজি বাগান ও একটি নার্সারি প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকা বিনিয়োগ করে গড়ে তোলা এই প্রকল্প দুটি থেকে বছরে প্রায় পনেরো হাজার টাকা আয় হয়। পাশাপাশি এলাকার নারীদের উন্নয়নের ঋষি পাড়ার কয়েকজন নারীকে নিয়ে একটি সংগঠন তৈরি করেছেন। সংগঠনের সদস্যরা সপ্তাহে পাঁচ টাকা করে সঞ্চয়ের মাধ্যমে একটি যৌথ পুঁজি গড়ে তুলেছেন। এই পুঁজি তিনি সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করেন। সংগঠনের ৩০ জন সদস্যের সকলেই বর্তমানে স্বাবলম্বী।

রমজান নগর ইউনিয়নে বসবাসকারী ঋষি সম্প্রদায় মূলত একটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। চলমান সমাজ ব্যবস্থায় যেন একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী। কেউ তাদের সাথে মেশে না। সকলেই তাদেরকে নীচু শ্রেণির মনে করে তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করে। ফলে আর্থিক, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তারা অনেক পিছিয়ে ছিলেন। বিষয়টি গীতার মধ্যে এক ধরনের যন্ত্রণাবোধ সৃষ্টি করে। মনে মনে তাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ শুরু করেন। এ সকল অনুষ্ঠানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিস্কাশন, পানি ও জল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর ফলে ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং তারা অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজেদের কাজ নিজেরাই করতে শুরু করেন। গীতার পরামর্শে ঋষি সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করেন। এ সময় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে কয়েকটি প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বর্তমানে ঋষি সম্প্রদায়ের শতভাগ বাসিন্দা নিরাপদ পানি পান ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। পাশাপাশি সকলেই নিয়মিত স্বাস্থ্যাভাস মেনে চলে। গীতার সহযোগিতায় ঋষি পাড়ায় একটি এনজিও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে এখানকার কোনো শিশু বর্তমানে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় না। এ সকল উন্নয়নের ফলে ঋষি পাড়ার পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। ঋষিদের বাড়িতে এখন টেলিভিশন রয়েছে। এমনকি কোনো কোনো বাড়িতে সৌর বিদ্যুৎ পর্যন্ত রয়েছে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকেরা এখন ঋষিদের সাথে চলাফেরা করেন।

ঋষি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি গীতা রমজান নগরের পিছিয়ে পড়া অপর একটি জনগোষ্ঠী মুণ্ডাদের উন্নয়নেও কাজ করে চলেছেন। ঋষিদের ন্যায় তাদের মধ্যেও একই পদ্ধতিতে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবর্তন এনেছেন তিনি। মুণ্ডাদের শিশুরা এখন স্কুলে যায়, তারা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানি ব্যবহার করে। মুণ্ডাদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য তাদের মধ্যে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন। সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সেখানে একটি যৌথ মূলধন গড়ে উঠেছে। মুণ্ডাদের আয় বৃদ্ধির জন্য গীতা বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে ১৩টি ভ্যান বিতরণ করেছেন। ভ্যানের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ থেকে তারা সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করছেন। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন কিস্তি পরিশোধ করে ভ্যানের মালিক হয়েছেন।

বহুমুখী এ সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০০৭ সালের মে মাসে নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন গীতা। এরপর নারীদের নিয়ে কাজ করার পথ আরো সুদৃঢ় হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি জেন্ডার, নারী পুরুষের বৈষম্য, নারীর অবস্থা ও অবস্থান, নারীর সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। যা তার জানার পরিধিকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রশিক্ষণের পর মুণ্ডা, ঋষিসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া সকল নারীর অধিকার নিয়ে কাজ শুরু করেন। মুণ্ডা ও ঋষিদের মধ্যে যৌতুক ও বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেশি থাকায় তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করেন। জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাত্র এক বছরের মধ্যে এই সম্প্রদায় দুটির মধ্যে যৌতুক প্রদান ও বাল্যবিবাহের ঘটনা প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি এ পর্যন্ত ৩টি ইস্যুভিত্তিক কর্মশালা, ২৮টি সাধারণ আলোচনা সভা এবং ২০টি উঠান বৈঠক করেছেন। এই কর্মশালা ও আলোচনা সভাগুলোতে যৌতুক, বাল্যবিবাহের অপকারিতা, এসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি, মাতৃস্বাস্থ্য, মাদকের ভয়াবহতা, জন্ম নিবন্ধন, ভোটার তালিকায় নাম নিবন্ধন, বিভিন্ন দুর্যোগকালে করণীয় প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

এভাবে এলাকার মানুষ ও নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করে চলেছেন গীতা। ইতোমধ্যে তিনি দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছেন। অনেকেই ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে গীতার অনুকরণে কাজ শুরু করেছেন। গীতা বিশ্বাস করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকেই তার মত এগিয়ে আসবে। নিজের ভাগ্যের পাশাপাশি অন্যদের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়তা করবেন। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে সোনার বাংলাদেশ।

নতুন ভোরের স্বপ্ন ও একজন ইন্দু প্রভার গল্প

কাজী ফাতেমা বর্নালী

মানুষের স্বভাবগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হলো জীবনের সাথে সংগ্রাম করা। বৈচিত্রময় পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয় তাকে। যুদ্ধে কখনো জয় আবার কখনো পরাজয় ঘটে। পুরুষের পাশাপাশি আমাদের নারীরাও যুগ যুগ ধরে অবদান রেখে যাচ্ছে এই লড়াইয়ে। আদিকাল থেকেই সমাজ পরিবর্তন বা দিন বদলের এই লড়াইয়ের অংশ নিয়েছে অগণিত নারী। কিন্তু এরপরও সামাজিক ও পারিবারিকভাবে প্রতিনিয়ত তারা নির্যাতিত হচ্ছেন। বঞ্চিত হচ্ছেন ন্যায্য অধিকার থেকে। তারা থেমে থাকেন না। এগিয়ে চলেন সামনের দিয়ে। নিজের ভাগ্যের পাশাপাশি অন্যের ভাগ্যেও এঁকে দেন পরিবর্তনের চিহ্ন। ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট থানার ইন্দু প্রভা অনুরূপ একজন নারী, যিনি একটি উপজাতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করার পরও থেমে থাকেন নি। এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে। নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের পাশাপাশি সমাজের অবহেলিত ও দুঃস্থ নারীদের কল্যাণে কাজ করে চলেছেন নিরলসভাবে।

হালুয়াঘাট থানার মনিকুড়া গ্রামে ১৯৫৪ সালের ১২ মার্চ ইন্দ্র প্রভার জন্ম। ছয় ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়। বাবা চিন্ত াহরণ রিছিল ও মা সান্তনা দ্রং কৃষির সাথে জড়িত। পাহাড়ের সাথে সংগ্রাম করে বেড়ে ওঠা ইন্দু প্রকৃতির ন্যায় সহজ সরল। সমাজসেবা করে চলেছেন প্রায় দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে। কথা প্রসঙ্গে তার পেশা জানতে চাইলে অনেকটা আবেগপ্রবণ হয়ে তিনি বলেন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যে সকল নারীরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হয়, তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই আমার প্রধান পেশা।

উপজাতি পরিবারে জন্ম নেয়া ইন্দু শৈশব থেকেই খুব শান্ত প্রকৃতির। বড় সন্তান হিসেবে বেশ আদরেই কেটেছিল তার শৈশব। ইন্দুদের সমাজে মদ্যপানকে একটি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু ইন্দুর মা সান্তনা দ্রং ঐ সমাজের একজন হওয়ার পরও কোন দিন ঐ পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন নি। স্বল্প শিক্ষিত হলেও চিন্তা-চেতনার দিক থেকে সান্তনা দ্রং ছিলেন বেশ আধুনিক। এ জন্য তাকে বাঙাল বলে কটাক্ষও করা হতো। সান্তনা দ্রং মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন। ভাবতেন মেয়ে বড় হয়ে গাঢ়োদের উন্নয়নে কাজ করবে! তাদের আলোর পথে নিয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এজন্য গারো সমাজের প্রচলিত সংস্কৃতির সাথে তেমন একটা জড়াতেন না তিনি। অপরদিকে ইন্দুর বাবা ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। গারো সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত মাতৃতান্ত্রিকতাকে উপেক্ষা করে তিনি সর্বদাই পুরুষতান্ত্রিক আচরণ করতেন। ফলে বাঙালি নারীর ন্যায় সান্তনা দ্রংকেও মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করতে হয়েছে। পারিবারিক এই বৈষম্য ইন্দুকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা যোগায়। লেখাপড়া করে একজন প্রকৃত মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি।

হালুয়াঘাট মিশন স্কুলে ভর্তির মাধ্যমে ইন্দুর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। প্রত্যহ দুই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে তিনি স্কুলে যেতেন। পঞ্চম শ্রেণিতে লেখাপড়ার সময় তার সহপাঠীর সংখ্যা অনেক কমে যায়। মূলত তৎকালীন সমাজে মেয়েরা তেমন একটা স্কুলে যেতো না। গেলেও পঞ্চম শ্রেণির পর তাদের লেখাপড়ার হার ছিল খুবই নগণ্য। ফলে সহপাঠীর অভাবে ইন্দুর শিক্ষাজীবনও অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু মেয়ের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার ব্যাপরে ইন্দুর মা নিজ সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। মেয়ে কিশোরী হওয়ায় ইন্দুকে বোডিং স্কুলে ভর্তি করে দেন। ১৯৭১ সালে ইন্দুর এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা থাকলেও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে তা আর সম্ভব হয় নি। অত্যাচার, মারামারি, মেয়েদের ধরে নেওয়া এসব ঘটনা দেখে মা-বাবা, ভাই-বোনসহ দেশান্তরী হতে বাধ্য হন। আশ্রয় নেন ভারতের মেঘালয় রাজ্যে অবস্থিত মামার বাড়িতে। সেখানে ইন্দুর অলস সময় কাটতে থাকে। দেশের এই মহান মুক্তিযুদ্ধে কোনো অবদান রাখতে না পারার কারণে তার মধ্যে এক ধরণের অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়। মামার বাড়ির পাশেই একটি শরণার্থী শিবির ছিল। সেখানে তিনি মিল্ক ফিডিং সেন্টারে কাজ শুরু করেন। গুঁড়ো দুধ রান্না করে শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা ছিল তার কাজ। এই কাজের মধ্য দিয়ে তার মনের অপরাধবোধ কিছুটা লাঘব হয়। মনে হতে থাকে দেশের জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও কিছু করতে পেরেছি। পাক হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের পর বাবা-মায়ের সাথে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন তিনি।

স্বাধীন দেশে নতুন করে পথ চলা শুরু হয় ইন্দু প্রভার। ১৯৭২ সালে তিনি এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ভর্তি হন হালুয়াঘাট কলেজে। ইন্দু যখন কলেজে লেখাপড়া করছিলেন তখন হালুয়াঘাটের একটি বেসরকারি হাইস্কুলকে কলেজে রূপান্তরিত করার কাজ শুরু হয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি ইন্দু এই কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েন। কোনো শিক্ষিকা মাতৃত্বকালীন ছুটিতে গেলে ইন্দু তার ক্লাসের দায়িত্ব নিতেন। ১৯৭৪ সালে এইচএসসি পাশ করে একই কলেজে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্নাতক শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তিনি শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত মিশন স্কুলে খণ্ডকালীন চাকরির সুযোগ পান। এভাবে ইন্দুর জীবনে লেখাপড়া ও চাকরি দুটোই পাশাপাশি চলতে থাকে।

১৯৭৬ সালে বিএ পাশ করার পর হালুয়াঘাট মিশনের সহযোগিতায় চার্চ অফ বাংলাদেশের বিশপ তাকে ব্যাঙ্গালোর থেকে হোস্টেল ম্যানেজমেন্ট-এর উপর এক বছরের কোর্স করিয়ে আনেন। দেশে ফিরে ১৯৭৭ সালে মিশনের কাজ করতে করতে মেহেরপুর জেলার যোসেফ সুধী মণ্ডলের সাথে পরিচয় ঘটে। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে নিজেদের বোঝাপড়ার মধ্যে বিয়ে করেন। চেনা জানা একজন অসাধারণ মানুষকে বিয়ে করলেও ইন্দু সমাজের প্রচলিত পুরুষতন্ত্রের বেড়াজাল ভেঙ্গে বের হতে পারেন নি। স্বামী যোসেফ ছিলেন পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় আষ্টে পিষ্টে বাঁধা। পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনাকে ভাঙ্গার যুদ্ধ শুরু হয় তার। ১৯৮০ সালে বিয়ের আগে থেকে তারা দুজনই হালুয়াঘাটের একই স্থানে চাকরি করতে। কিন্তু বিয়ের পর স্বামী তার চাকরিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই চাকরি ছেড়ে ১৯৮১ সালে স্বামীর সাথে যশোরে চলে আসতে হয়। স্বামী যশোরে এসে নতুন করে ব্যবসা শুরু করে, অন্যদিকে ইন্দু নারীত্বের পূর্ণতার কাজে নিয়োজিত হন। এভাবেই কেটে যায় কয়েক বছর। বিভিন্ন প্রতিকূলতা পার করে স্বামীকে বুঝিয়ে ১৯৮৪ সালে 'বাঁচতে শিখা'য় যোগদান করেন। ১৯৮৫-২০০৩ সাল পর্যন্ত কাজ করার পর তাদের প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২০০৩ সালেই একটি সংগঠন শুরু করেন তিনি। দুই জন স্টাফসহ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৭ জন। বৃত্তের বাইরে মহিলা ও শিশু উন্নয়ণ সংস্থা নামের এই সংগঠনের সদস্যরা পাঞ্জাবী, শাড়ী, বিছানার চাদর প্রভৃতি সামগ্রী হাতে তৈরি করে ঢাকায় বিক্রি করতেন। ইন্দু তার চাকরি থেকে জমানো ৭০,০০০ হাজার টাকা ব্যয় করে এই কাজগুলো শুরু করেছিলেন। প্রথম বছরে তার আয় হয় ২,৫০,০০০ টাকা।

এভাবে কেটে যায় কয়েক বছর। ২০০৬ সালে সাতক্ষীরার নারীনেত্রী মরিয়ম মান্নানের সাথে আলাপচারিতার মাধ্যমে তিনি 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক- এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণের কথা জানতে পারেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আয়োজনে ২০০৭ সালের মে মাসে ২৫-২৭ যশোরে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে জেন্ডার, নারী-পুরুষের সমতা, নারীদের অবস্থা এবং অবস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলো তার মনে দাগ কাটে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের প্রতি তার আত্মবিশ্বাস অনেক বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে, কেবলমাত্র নারীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটি চেতনা সৃষ্টি করতে পারলেই সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের সমানের দিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। তাই তিনি প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে সমাজের দুঃস্থ ও পিছিয়ে পড়া নারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর এ বিষয়ে তিনি যে কাজগুলো করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	বিষয়	সংখ্যা
১	আলোচনা সভা	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, যৌতুক ও বাল্যবিবাহের কুফল এবং সমাজে এর প্রভাব, বই পড়া, নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভোটার ও জন্ম নিবন্ধন এবং আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম	১০টি
২	দিবস পালন	আন্তর্জাতিক নারী দিবস, জাতীয় কন্যাশিশু দিবস, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, এইডস দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, রোকেয়া দিবস, বিজয় দিবস প্রভৃতি	৮টি
৩	মত বিনিময় সভা	মাদক বিরোধী আন্দোলন	২টি
৪	আইনি সহায়তা	নির্যাতিত নারীদের আইনি সহায়তা প্রদান	২টি

ইন্দু প্রভা তার কর্মকাণ্ডকে শুধুমাত্র নিজের উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। এ সকল কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি নিজ গ্রামের সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। ভারতের ব্যাঙ্গালোর থেকে কোর্স শেষে দেশে ফিরে নিজ গ্রামের গারোদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত মদ্যপান প্রথার বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেন। এরূপ একটি ইতিবাচক কাজ করতে গিয়ে প্রথমদিকে পল্লীর কাউকেই তিনি পাশে পান নি। সকলেই একে গারো সমাজের রেওয়াজ বলে এই ইন্দুর বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইন্দু তার সিদ্ধান্তে ছিলেন অটল। খালাতো ভাই-বোন ও দুই বন্ধুকে সাথে নিয়ে তিনি গারো পল্লীগুলোতে মদ্যপানের কুফল এবং সমাজে এর নেতিবাচক প্রভাবগুলো তুলে ধরতে থাকেন। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কমিউনিটির লোকদের মদ্যপান থেকে বিরত থাকা এবং চার্চে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। পাশাপাশি তারা গোপনে পল্লীর মদ্যপানের আখড়াগুলোতে হামলা চালাতে শুরু করেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে গারো সমাজের মধ্যে মদ্যপানের অপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং সমাজের একটি বড় অংশ ইন্দু প্রভার কার্যক্রমকে সমর্থন করতে শুরু করে। এভাবে আস্তে আস্তে হালুয়াঘাটের গারোপল্লী থেকে মদ্যপান প্রথা উঠে যায়। ফলে সেখানে আজ মদ্যপান ও মাতলামির পরিবর্তে শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। গারো পল্লীর বাসিন্দারা এখন প্রার্থনার জন্য নিয়মিত গীর্জায় যায়। তাদের ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে এবং শিক্ষিত হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানতে চাইলে ইন্দু প্রভা জানান, আমার স্বপ্ন নারীদের উন্নয়নে একটি বড় আকারের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে নির্যাতিত নারীদের আইনি সহায়তা, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তাদের বিভিন্ন দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব হবে। যার চূড়ান্ত ফলাফল সমগ্র নারী

জাতিকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করবে। চলমান পুরুষতান্ত্রিকতার পরিবর্তে গড়ে উঠবে বৈষম্যহীন নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক নতুন সমাজ ব্যবস্থা। ইন্দু প্রভার স্বপ্ন আমাদেরও নতুন সকালের রাস্তা দেখায়। আমরাও অপেক্ষায় রইলাম, বৈষম্যহীন নতুন ভোরের প্রত্যাশায়।

জীবন খুঁজে পেতে দৃঢ়কল্প রত্নাদি

মুনমুন ইসলাম

আমাদের দেশের নারীরা চার দেয়ালের বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে এসেছে– এই ঘটনা খুব বেশি দিন আগের নয়। একসময় সন্তান উৎপাদন এবং রান্নাঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাদের জীবন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জীবনকে সাজিয়ে দিতেই সে বেশি ব্যস্ত থাকত। নিজের জীবনকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার সময় পেত না। তবে আধুনিক যুগে বিভিন্ন মনীষীর প্রচেষ্টায় পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে শুরু করে। প্রসার ঘটে নারী শিক্ষার। ক্রমান্বয়ে তারা ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। তবে নারীর এই বেড়িয়ে আসার কাহিনী খুব সহজ নয়। পরিবারের পুরুষ কর্তারা যখন বুঝেতে পেরেছে যে, নারীকে সম্পূর্ণ পিছিয়ে রেখে পরিবারকে আলোকিত করা যাবে না, সুখী পরিবার গড়তে হলে আলোকিত পুরুষের পাশাপাশি আলোকিত নারীরও প্রয়োজন– তখন থেকেই পরিবারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা কিছুটা হলেও গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ফলে তারা পরিবারকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। ইতিবাচক ফলাফলও আসতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় যুগ যুগ ধরে অসংখ্য নারী তাদের পরিবারকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখে গেছেন। কুড়িগ্রামের রত্না ঘোষ অনুরূপ একজন নারী। যিনি শত প্রতিকূলতার মাঝেও এগিয়ে চলেছেন আপন লক্ষ্যে। সফলতার মাধ্যমে নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া দুঃস্থ নারীদের কল্যাণে কাজ করে চলেছেন।

রত্না ঘোষের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় রংপুরে অনুষ্ঠেয় বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ১৩তম ব্যাচের ফাউন্ডেশন কোর্সে। খুব চোখে পড়ার মত কেউ নন তিনি। শান্ত ও নম্র চেহারায় বসে থাকতেন। কখনও দেখে মনে হয় নি যে, বেঁচে থাকার জন্য জীবনের বেশিরভাগ সময় সংগ্রাম করতে হয়েছে এই মহিলাকে।

রত্না ঘোষের জন্ম কুড়িগ্রামের মিস্ত্রি পাড়ায়। জন্মের সাল তিনি জানেন না। জিজ্ঞেস করলে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল চার বছর। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে পঞ্চম তিনি। বড় হয়েছেন কুড়িগ্রাম শহরেই। রত্নার বয়স যখন চার বছর তখন দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। শৈশবেই তিনি যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং মানুষরূপী পশুদের ধ্বংসলীলা দেখেছেন। বাবা-মায়ের হাত ধরে এই গ্রাম থেকে সেই গ্রামে পালিয়ে বেড়িয়েছেন এবং এক পর্যায়ে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়েছেন।

যুদ্ধ শেষ হলে বাবা-মায়ের সাথে স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন। স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। ছয় ভাই-বোন আর বাবা-মাসহ সংসারটা বেশ বড়ই ছিল তাদের। তাই দরিদ্র বাবার পক্ষে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করা ছিল বেশ কঠিন। ফলে তখন থেকেই তার জীবন সংগ্রাম শুরু হয়। পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে পরীক্ষার ফি জোগার করতে না পারায় পরীক্ষা দেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি রত্নার ছিল ভীষণ আগ্রহ। তাই সুপারি গাছে উঠেন সুপারি চুরি করার জন্য। কিন্তু গাছ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। বিষয়টি স্কুলের বিএসসি শিক্ষক জানতে পেরে রত্নার পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নকাল থেকেই রত্না টিউশনির মাধ্যমে নিজের লেখা-পড়ার খরচ নিজেই সংগ্রহ করতেন। অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে একটি সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ আসে তার জীবনে। সুযোগটি হাতছাড়া করেন নি। মনোযোগ সহকারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রতিবেশীদের দু-একটি করে কাপড়ও সেলাই করে দিতে শুরু করেন। সেলাই ও টিউশনি করে যে টাকা পেতেন তা দিয়ে লেখা-পড়ার খরচ চালাতেন।

আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় শৈশব থেকেই রত্নাকে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হত। ভোরের সূর্য উঠার পূর্বেই তিনি গরুর গোবড় কুড়াতে বেড়িয়ে পড়তেন। সংগৃহীত গোবড় দিয়ে ঘুষি বানিয়ে তা বাজারে বিক্রি করে সংসারের ছোট খাটো খরচের ক্ষেত্রে বাবাকে সহযোগিতা করতেন। এভাবেই নিজের অপরিসীম প্রচেষ্টা এবং শিক্ষকদের সহযোগিতায় পড়াশুনা চালিয়ে যেতে থাকেন। স্বপ্ন দেখতে থাকেন একটি সুন্দর ভবিষ্যতের। কিন্তু দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখা-পড়ার পর পরীক্ষার ফি জমা দিতে না পারার কারণে এসএসসি পরীক্ষা দেওয়া হয় নি রত্নার।

এরপর বাড়িতে বসে থাকা, সংসারের বিভিন্ন কাজে বাবা-মাকে সহায়তা করা এভাবেই সময় কেটে যেতে থাকে। অন্যদিকে বাবা-মা মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে থাকেন। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তপন কুমার ঘোষের সাথে বিয়ে হয় রত্নার। বিয়ের সময় স্বামী চালের ব্যবসা করতেন। বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যে তপন ঘোষের ব্যবসা লোকসানের মুখে পড়লে ভাইয়েরা তাকে যৌথ পরিবার থেকে আলাদা করে দেয়। ফলে সংসারে মারাত্মক আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। এরই মধ্যে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে তাদের ঘর আলোকিত করে আসে বড় ছেলে মাধব ঘোষ। স্বামী রাজ মিস্ত্রি ও রং মিস্ত্রির কাজ করে কোনো রকমে সংসার চালাতে থাকেন।

এভাবে কেটে যায় কিছু দিন। ১৯৯০ সালে অভাব-অনটন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় নতুন কাজের সন্ধানে তারা নাগেশ্বরী উপজেলা সদরে চলে যান। সেখানে গিয়ে তপন মোটর মেকানিকের কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি রত্না সেলাই ও টিউশনির মাধ্যমে মাসে গড়ে প্রায় দেড় হাজার টাকা করে আয় করতে শুরু করেন। নাগেশ্বরীতে আসার পর রত্নার সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। স্বামী-স্ত্রী মিলে যে আয় করতেন তা দিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করার পরও প্রতি মাসে কিছু টাকা সঞ্চয় করতে থাকেন।

রত্নার এই সুসময় বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। হঠাৎ করেই কুড়িগ্রামে অবস্থানরত তার মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে স্বামীসহ রত্না পুনরায় কুড়িগ্রামে ফিরে আসেন। তপন কুমার ঘোষ এ সময় মোটর মেকানিকের কাজ ছেড়ে রত্নার ছোট ভাইয়ের সাথে মুরগীর ব্যবসা শুরু করেন। অন্যদিকে সেলাই ও টিউশনি ছেড়ে রত্না দিন রাত মায়ের সেবা করতে থাকেন। এর মধ্যে হঠাৎ করেই স্বামীর কিডনিতে সমস্যা দেখা দেয়। ফলে মায়ের পাশাপাশি স্বামীর সেবা এবং চিকিৎসা খরচ যোগারের দায়িত্ব রত্নার উপর ন্যস্ত হয়। খুব দ্রুত তাদের জমানো টাকা ফুরিয়ে যায়। ফলে নতুন করে সংসারে অভাব দেখা দেয়। শুরু হয় অমানুষিক পরিশ্রম। বিভিন্ন জায়গায় চাকরির চেষ্টা করেও কোনো লাভ হয় নি। এভাবে কেটে যায় কিছুদিন। অবশেষে সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্সুরেন্সের ফিল্ড অফিসার পদে একটি চাকরি পান। সামান্য কমিশনের এই চাকরি রত্নার সংসারে কোনো সচ্ছলতা বয়ে না আনলেও জীবনে একটি স্থিরতা নিয়ে আসে।

ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করার সুবাদে রত্নার সাথে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচয় হয়। জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-কুড়িগ্রামের সভাপতি সাঈদা ইয়াসমিন ছিলেন অনুরূপ একজন ব্যক্তি। পরবর্তীতে সাঈদার সহযোগিতায় হাঙ্গার প্রজেক্টের নারী নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে রত্না সমাজের প্রতি তার দায়িত্ববোধের বিষয়টি উপলব্ধি করেন এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের জন্য কিছু একটা করার চিন্তা শুরু করেন। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে এলাকার দরিদ্র মহিলাদের একত্রিত করে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সাপ্তাহিক দশ টাকা করে সঞ্চয়ের মাধ্যমে তারা সামাজিক পুঁজি গড়ে তোলেন। এই পুঁজি থেকে সদস্যরা স্বল্পসুদে ঋণ নিয়ে থাকেন। ফলে সমিতির সদস্যদের এখন আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো মহাজনের কাছ থেকে উচ্চ সূদে ঋণ গ্রহণ করতে হয় না। প্রতি সপ্তাহে একবার করে সমিতির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আয়-ব্যয় ছাড়াও গ্রামের যেকোনো ধরণের সামাজিক সমস্যা, নারী শিক্ষা, যৌতুক ও বাল্যবিবাহের অপকারিতা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

প্রশিক্ষণ থেকে ফেরার কিছুদিন পর রত্না চাকরির পাশাপাশি তার পূর্বের সেলাই কার্যক্রমকে পুনরায় শুরু করেন। বর্তমানে চাকরি এবং সেলাইয়ের মাধ্যমে যে অর্থ অর্জিত হয় তা দিয়ে রত্নার সংসার বেশ ভালোভাবেই চলে যায়। গ্রামের দরিদ্র, দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে রত্না তার সেলাই কার্যক্রমের সাথে পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েকজন মহিলাকে যুক্ত করেছেন। মহিলাদের তিনি বিনা পয়সায় সেলাই শেখান। রত্নার কাছ থেকে কাজ শিখে প্রায় আট জন মহিলা আজ স্বাবলম্বী হয়েছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণের পর তিনি জীবন সম্পর্কে একটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছেন। নিজের এবং সমাজের অন্যান্য নারীদের জীবনে আনতে চান আমূল পরিবর্তন। সেই লক্ষ্যে বিরতিহীনভাবে কাজও করে চলেছেন। রত্না ঘোষ মনে করেন, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমেই নারীরা পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে পারেন। প্রথমেই মেয়েদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। এজন্য সরকার কিংবা কোনো গোষ্ঠীর মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। নারী উন্নয়নে নারীদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। তবেই বৈষম্যহীন নারী নির্যাতন মুক্ত স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। রত্না ঘোষ এই সত্যকে বিশ্বাস করে এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে। আমাদেরও উচিৎ রত্না ঘোষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সে পথেই এগিয়ে চলা।

নারীবাদী শামীম আক্তারের গল্প

ড. মোস্তাফিজুর রহমান

ঘড়ির কাঁটা সকাল ৯ টার ঘরে পৌঁছার পূর্বেই নিয়মিত অফিসে আসেন শামীম আক্তার শামীম। ব্যাগভর্তি ভ্যাকসিন আর প্রাথমিক পরিচর্যার ঔষধগুলো সাজিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের মাঠে পাঠিয়ে দেন। এরপর শুরু হয় তার ছোটাছুটি। কক্সবাজার পৌরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তি ও গ্রামীণ জনপদগুলোর নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য শুরু হয় তার কার্যক্রম। কোথাও স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় আবার কোথাও কোথাও তিনি নিজেই মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকেন। সারাদিন খেটে খাওয়া মানুষগুলোর সেবা প্রদানের পর ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে শুরু হয় সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়। সন্তানদের লেখাপড়া, স্বামীর ব্যবসা সবই সামলাতে হয় তাকে। এর ফাঁকেই আবার কাজ করেন অসহায় ও নির্যাতিত নারীদের উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে। শামীমের সহযোগিতায় আজ প্রায় অর্ধ শতাধিক মহিলা আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন। দাঁড়াতে শিখেছে নিজের পায়ে ভর করে। অন্যদিকে প্রায় পনেরো জন মহিলা ও শিশু ন্যায়বিচারের মাধ্যমে ফিরে পেয়েছেন তাদের অধিকার।

পাক হানাদার বাহিনীর পরাজয় যখন প্রায় নিশ্চিত এরূপ এক সময়ে শামীমের জন্ম। ১৯৭১ সালের ২৯ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার ঠাকুরদিঘী গ্রামে জন্ম নেওয়া শামীমের পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী। কক্সবাজারে তিনি ব্যবসা করতেন। ফলে জন্মের কিছুদিন পরেই মায়ের সাথে কক্সবাজার আসেন। কক্সবাজার বার্মিজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয়। কিন্তু পারিবারিক কারণে মায়ের সাথে গ্রামে ফিরে যেতে হয় এবং লোহাগাড়া শাহপীর উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৮৭ সালে এসএসসি পরীক্ষার পর কক্সবাজার শহরের টেকপাড়ার ব্যবসায়ী শওকত আলমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর তিনি স্বামীর সাথে শ্বশুরবাড়িতে বসবাস শুরু করেন। যৌথ পরিবারের হাজারো সমস্যা মোকাবেলা করতে হয় সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ এই বধূকে। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় এবং শামীম দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের পর শামীমের শিক্ষা জীবনকে কেন্দ্র করে নতুন এক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। রক্ষণশীল পরিবারের শ্বশুর-শাশুড়ি পুত্রবধূর কলেজ শিক্ষাকে কখনোই সমর্থন করেন নি। এমনকি তারা শামীমের কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করেন। কিন্তু স্বামী ছিল শামীমের নিকটতম বন্ধু। তিনি স্ত্রীর চাওয়া-পাওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারতেন এবং স্ত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। অবশেষে স্বামীর সহযোগিতায় লোহাগাড়া থানার বারো আউলিয়া ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে ১৯৮৯ সালে এইচএসসি ও ১৯৯২ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ভর্তি হন কক্সবাজার সরকারী আইন কলেজে। প্রথম বর্ষ সমাপ্ত হওয়ার পর পরই কক্সবাজার পৌরসভায় তিনি চাকরি পান। চাকরি পেলেও যোগদানের ক্ষেত্রে পুনরায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। ঘরের বউ চাকরি করলে পরিবারের সম্মান মাটিতে মিশে

যাবে – সেকেলে এই যুক্তির মাধ্যমে শামীমকে চাকরিতে যোগদান হতে বিরত রাখার চেষ্টা করে তার শ্বশুর-শাশুড়ি। কিন্তু এবারও স্বামী পাশে এসে দাঁড়ান। ফলে চাকরিতে যোগদানের পথ সুগম হয়।

শৈশব থেকেই শামীমের স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে মানুষের সেবা করা। মূলত বাবা-মায়ের কাছ থেকে তিনি এ বিষয়ে উৎসাহিত হয়েছিলেন। গ্রামের যে কোনো ধরনের বিচার-সালিশে শামীমের বাবাকে সামনে থেকে দায়িত্ব পালন করতে হত। এছাড়া তার বাবা-মা এলাকার দরিদ্র ও বিপদগ্রস্ত লোকদের নিয়মিতভাবে সহায়তা করতেন। বাবা-মার এ সকল কর্মকাণ্ড তার শিশু মনকে প্রভাবিত করেছিল। চাকরি পাওয়ার পর তার এই চিন্তা আরো প্রবল হয়। শহরের বিভিন্ন বস্তিতে বসবাসকারী মানুষগুলোর আর্থিক দুর্দশা ও মানবেতর জীবন যাপন তাকে যন্ত্রণা দিতে শুরু করে। এছাড়া বস্তিসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী নির্যাতনের বিষয়টিও তাকে ভাবিয়ে তোলে। তবে অফিসের সহায়তায় তাদের মধ্যে তিনি ঋণ কার্যক্রম, চিকিৎসা সেবা বিশেষ করে শিশু ও মার্তৃস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন। পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে দুঃস্থ নারীদের উন্নয়নে উঠান বৈঠক শুরু করেন। বৈঠকগুলোতে নারী শিক্ষা, গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য, নিরাপদ প্রসব, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করতেন। এ পর্যায়ে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। অফিস ও নিজ উদ্যোগে শুরু করা কাজগুলোর মাধ্যমে বস্তিতে বসবাসকারী নিম্ন আয়ের মানুষদের কিছুটা উন্নয়ন হলেও শামীম পরিতৃপ্ত হতে পারছিলেন না। তবে ইতোমধ্যে কক্সবাজার জেলা শহরে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে শামীম একটি পরিচিত মুখে পরিণত হন।

কক্সবাজারের স্থানীয় উজ্জীবকরা ২০০৩ সালে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ৩০ সেপ্টেম্বর মূল অনুষ্ঠানে তারা শামীমকে অতিথি হিসেবে দাওয়াত করেন। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, উজ্জীবক প্রশিক্ষণ এবং উজ্জীবকদের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হন। এলাকার উজ্জীবক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জনাব সাখাওয়াত হোসেনের সাথে তার পরিচয়ও ঘটে।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কৌতূহল ও আগ্রহ এবং উজ্জীবকদের আমন্ত্রণে কক্সবাজার রাখাইন বুদ্ধিষ্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনে অনুষ্ঠেয় অথবা ৯৮৩তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন শামীম। প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলো তার ভীষণ ভালো লাগে। শামীমের ভাষায়, প্রশিক্ষণের পূর্ববর্তী সময়ে নারী উন্নয়নে আমি যে সকল কাজ করেছিলাম তা ছিল বিক্ষিপ্ত ও অগোছালো। তাছাড়া আমার কাজগুলো কেবলমাত্র মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রশিক্ষণের পর আমি দৃঢ় মনোবল সহকারে পরিকল্পিতভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হই। প্রশিক্ষণের পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে শামীম তার কর্ম এলাকার নারী শিক্ষা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। পাশাপাশি মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ৫০ জন করে মহিলাকে নিয়ে মোট পাঁচটি সমিতি গঠন করেন। সমিতিগুলোর মাধ্যমে শামীম সঞ্চয়ের দ্বারা সামাজিক পুঁজি গঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক ও সচেনতাবৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। তার প্রচেষ্টায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এবং যুব উন্নয়নের সহায়তায় কক্সবাজারের বিভিন্ন বস্তিতে প্রায় ১০টি ব্যাচের সেলাই প্রশিক্ষণ, গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুপালনসহ বিভিন্ন দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণগুলোর মাধ্যমে কক্সবাজার পৌর এলাকার এক হাজারেরও বেশি নারী আজ জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

শুধুমাত্র নারীদের সচেতন ও স্বাবলম্বী করার মধ্যেই শামীম তার কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। ভবিষ্যতে যেন আর কোনো নারীকে নির্যাতনের শিকার হতে না হয় এজন্য তিনি এলাকায় নির্যাতিত নারীদের আইনি সহায়তা প্রদানের কাজ করে চলেছেন। ফলে নির্যাতিতা একদিকে সুবিচার পাচ্ছেন, অন্যদিকে নির্যাতনকারীকে আইনের হাতে তুলে দিয়ে অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য আদালতের কাছে শরণাপন্ন হচ্ছেন। নির্যাতিত নারীদের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে

শামীমের নামে থানায় মামলা দায়ের এমনকি তাকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। শত শত নির্যাতিত নারীকে তিনি আইনি সহায়তা প্রদান করেছেন। উদাহরণ হিসেবে নিম্নে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা হল।

এক. চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার মেয়ে সুফুরা খাতুনের (ছদ্ম নাম) সাথে একই এলাকার ব্যবসায়ী ওসমান গুণির প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ওসমান গুণি কক্সবাজার শহরে ব্যবসা করতেন। প্রণয়ের এক পর্যায়ে ওসমান গুণি সুফুরাকে কক্সবাজারে নিয়ে আসে এবং বিয়ের প্রলোভন দিয়ে তাকে নিয়ে একটি আবাসিক হোটেলে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করেন। পরবর্তীতে সুফুরা বিয়ের কথা বললে ওসমান গুণি তাকে অস্বীকার করে এবং 'খারাপ মেয়ে' বলে প্রচার শুরু করেন। ওসমান গুণির বিশ্বাস ঘাতকতা এবং খারাপ মেয়ের অপবাদের কারণে সুফুরা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। পরবর্তীতে ঘটনাটি ফাঁস হয়ে গেলে ওসমান গুণি সফুরাকে হত্যার চেষ্টা চালায়। নিরুপায় হয়ে সফুরা ঘটনার কুড়ি দিন পর শামীমের সাথে যোগাযোগ করে সকল ঘটনা খুলে বলে। প্রকৃত ঘটনা অবগত হওয়ার পর শামীম উভয় পক্ষকে নিয়ে একটি সালিশের আয়োজন করেন এবং মেয়েটিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে ওসমান গুণিকে বাধ্য করেন। কিন্তু কয়েকদিন পর ওসমান গুণি সফুরাকে ঘরে তুলে নিতে অস্বীকার করে এবং শামীমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অন্যদিকে শামীমও মেয়ে পক্ষকে দিয়ে ওসমান গুণির বিরুদ্ধে একটি মামালা করান। পরবর্তীতে শামীম প্রশাসনের মাধ্যমে নির্দোষ প্রমাণিত হন। বর্তমানে সফুরার দায়ের করা মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

দুই. কক্সবাজার শহরের কলাতলীর জনৈক দিনমজুরের চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে মৌসুমী (ছদ্ম নাম) ২০০৭ সালের ১৮ অক্টোবর বনে লাকড়ি (জ্বালানী) কুড়াতে গিয়েছিল। ১৪ বছরের এই কিশোরী স্থানীয় রইস উদ্দীন নামক এক ব্যক্তির কাছে খাবারের পানি চাইলে সে তাকে খাবারের প্রলোভন দিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে প্রায় চার ঘন্টা আটকে রেখে পাশবিক নির্যাতন করে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়লে বিকেলের দিকে সেই নরপশু মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। মেয়েটি বাসায় ফিরলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বিষয়টি জানার পর শামীম পরদিনই স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ঘটনাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় উজ্জীবকদেরকে নিয়ে থানার সাথে যোগাযোগ করেন। শামীমের এই উদ্যোগের ফলে অপরাধী গ্রেফতার হয়। পরবর্তীতে রইস উদ্দীন জামিনে বের হয়ে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে বিষয়টির নিস্পত্তি করে।

উপরের ঘটনা দুটি শামীমের কার্যক্রমের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র। এরূপ আরো অনেক ঘটনার সাথে তিনি জড়িত। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে তার এই উদ্যোগগুলোর ফলে এলাকায় নারী নির্যাতনের ঘটনা পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি বাড়ছে জনসচেতনতা।

পৌরসভায় চাকরির পাশাপাশি তিনি কক্সবাজারের বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক আজকের দেশ বিদেশ' পত্রিকার নারীর পাতার বিভাগীয় সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন শামীম। এছাড়া বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার থেকে প্রচারিত নারী মহল অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। কাজের অবসরে কবিতা লিখতে ভালোবাসেন। ২০০৩ সালে স্বরচিত ৪০টি কবিতা নিয়ে 'বিবর্ণ প্রজাপতি' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ

প্রকাশ করেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এই কাজগুলোর মাধ্যমে মানবতাবোধ, আত্মত্যাগ এবং খেটে খাওয়া মানুষগুলোর দিনযাপনের করুণ সুর প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ইন্ধন যোগায় সমাজের অবহেলিত ও নিপীড়িত নারীদের বেঁচে থাকার। এসবের পাশাপাশি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নিজস্ব চিন্তা-চেতনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। বর্তমানে শামীম বাংলাদেশ মানবাধিকার জেলা কমিটি, ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং (ফেমা), রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, এফপিএবি, নারী বান্ধব হাসপাতাল, উজ্জীবক ফোরাম, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক, প্রথম আলো বন্ধুসভা, পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সাথে যুক্ত। সভা, সমাবেশ প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণে প্রণোদিত করে চলেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে দুই কন্যা সন্তানের জননী শামীম আক্তার সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ বিশেষত দুঃস্থ ও নির্যাতিত মহিলাদের সাথে কাজের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চান। পাড়ি দিতে চান আরো অনেক পথ। যার মাধ্যমে সমাজের সকল অশুভ শক্তিগুলোকে পরাজিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে গঠিত হবে নারী-পুরুষ বৈষম্যহীন একটি নতুন সমাজ। আর এরূপ একটি সমাজকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন শামীম আক্তার শামীম।

অচলায়তন ভেঙে এগিয়ে চলেছেন দিঘুলিয়ার লাইলী বেগম

সরস্বতী রানী পাল

টাঙ্গাইল জেলা শহর। পুরাতন বাসস্ট্যান্ডের নিরালার মোড় থেকে রিক্সায় দূরত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার। শহর থেকে কলেজপাড়া হয়ে লোহজোং নদীর পার ধরে পায়ে হাঁটা পথ। কিছুটা অগ্রসর হলে দিঘুলিয়া পাঠশালাটি চোখে পড়ে। এ পথ ধরেই যেতে হয় পশ্চিমপাড়ার সবার পরিচিত লাইলী আপার বাসায়। এক সারিতে বেশ কয়েকটি টিনের ঘর। এখানেই তিনি অপেক্ষমান ছিলেন শহর থেকে আসা আগন্তুকের জন্য। নিজ জীবনের সংগ্রামী কথাগুলো জানানোর জন্য ছিল তার অধীর আগ্রহ। 'জীবনে কোনো সাফল্য নেই, আছে শুধু দুঃখের ঘটনা' এই লাইনটি দিয়েই লাইলী শুরু করলেন তার কথাগুলো।

ছোটবেলায় বাবা আজাহার আলী আদর করে ডাকতেন মা লালন বলে। বড় হয়ে লতিফা আক্তার ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন লাইলী বেগম। মা কাজী রাবেয়া বেগম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারে সেলাই শিক্ষয়িত্রীর চাকরি করতেন। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে লাইলী দ্বিতীয়। পর পর তিন কন্যাসন্তানের জন্য বাবা পরিবারের কোনো খোঁজখবর নিতেন না। মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যেতেন। হঠাৎ একদিন আজাহার আলী দ্বিতীয় স্ত্রী এবং দুই মাসের ভাইকে নিয়ে ঘরে ফিরলে পরিবারে অশান্তি র সূচনা হয়। মনোমালিন্যের সূত্র ধরে নতুন মা দা হাতে লাইলীকে আঘাত করতে এলে ভয়ে দরজা খুলে দৌঁড়ে পালায় কিশোরী লাইলী। এছাড়া উগ্র জেদের বশে তিনি একদিন লাইলীর দুই মাস বয়সী বোনকে চলমান ঘোড়ার গাড়ির নীচে ফেলে দেন। লাইলীর শৈশব স্মৃতিতে এ রকম বহু ঘটনা আছে যা তাকে আজও তাড়িয়ে বেড়ায়।

আজাহার আলীর দ্বিতীয় বিয়ের পর লাইলীর মা বাবারবাড়ি চলে যান। কিছু দিন পর বাড়িতে ফিরে আসেন। লাইলী পশ্চিম দিঘুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ফাঁকে মায়ের কাছ থেকে সেলাইয়ের কাজ শিখতেন। এ সময় মা মেয়ে মিলে সেলাইয়ের মাধ্যমে আর্থিক উপার্জনের পথ তৈরি করেন। সেলাইয়ের আয় থেকে অনেক কষ্টে সংসার ও তাদের লেখাপড়ার খরচ চলত। পরিবারের নানা প্রতিকূলতার মাঝেও ১৯৭৩ সালে টাঙ্গাইল নতুন গার্লস হাই স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন তিনি।

দিঘুলিয়া মধ্যপাড়ার মোহাম্মদ আকবর হোসেন খান পিয়ন পদে বিআইডিসি'তে চাকরি করতেন। শৈশবে প্রতিবেশী আকবরদের বাগানে ফুল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাল্য প্রেম হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে বিষয়টি বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে লাইলী-আকবরের নতুন জীবন শুরু হয়। আকবরের আয় যথেষ্ট ছিল না। তাই ভালোবেসে বিয়ে করে যেন নিজ থেকেই সর্বনাশ ডেকে আনলেন।

বিয়ের দুই বছর পরের ঘটনা। কর্মস্থলের জটিলতার কারণে বেতন বন্ধ ছিল আকবরের। ফলে সন্তান সম্ভবা লাইলীকে প্রায়ই অভুক্ত থাকতে হত। তার ভাষায়, প্রোথম মেইয়্যা যেদিন অইল, হেইদিন আমি তিন দিনের না খাওয়া। ঘরে তেল আছিল না, দোয়াতের তেল নিভা গেচিল, চাইরদিকে আন্দার! চিক্ষার হুইন্যা বুজচি আমি মা অইচি...। পেটের খিদায় দুব্বল সরীরে অনেক ঘুইর‍্যা কাঁচা কলা পাইচি; খিদার জ্বালা মিটাইচি। আর্থিক সমস্যা লাঘবের জন্য লাইলী কিছু করতে

চাইলে আকবর বাধা দিতেন। ফলে সংসারের আর্থিক অনটন লেগেই থাকত। এর মাঝে কোলজুড়ে আসে দ্বিতীয় কন্যাসন্তান।

দ্বিতীয় কন্যাসন্তান জন্মের পর আকবর মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যেতেন। ফলে সংসারের আর্থিক সঙ্কট বাড়ে বৈ কমে না। অনেক চেষ্টার পর লাইলী দিঘুলিয়ার একটি বিড়ির ফ্যাক্টরীতে কাজ জোগাড় করেন, যার মাধ্যমে সপ্তাহে ২০০-৩০০ টাকা আয় হত। কিন্তু এই টাকা তাদের খাওয়া খরচ বাবদ শেষ হয়ে যেতো। ফলে সংসারের অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনতে পারতেন না। এমনকি কোরোসিন তেল কিনতে না পারার কারণে সন্ধ্যায় ঘরে বাতি জ্বালাতে পারতেন না। তাই চাঁদের আলোতে খাওয়া ও অন্যান্য কাজ সেরে নিতেন। বসবাসের জন্য কোনো ঘর না থাকায় সন্তানদের নিয়ে গোয়াল ঘরে থাকতেন তিনি। গোয়াল ঘরের একদিকে গরু, একদিকে উন্মাদ ভাসুর আর একদিকে তিন সন্তানদের নিয়ে ঘুমাতেন। অনেক কষ্টে লাইলী দেড়শ টাকা সংগ্রহ করে ঘর তৈরির জন্য কিছু বাঁশ কেনেন। কিন্তু একদিন ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে দেখেন বাঁশগুলো নেই। প্রতিবেশীদের মাধ্যমে জানতে পারেন, আকবর এসে সেগুলো একশ টাকায় বিক্রি করেছেন। ফলে ঘর তোলার স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। সন্তানরা বড় হতে থাকে সাথে সাথে সংসারের অভাবও বৃদ্ধি পায়। মাঝে মধ্যে আকবর এলেও তিনি স্ত্রীকে সহযোগিতার পরিবর্তে বাইরে গিয়ে কাজ করতে নিষেধ করতেন। এদিকে ভালোবাসার স্বপ্নডানায় ভর করে লাইলী আপার কোলজুড়ে আসে তৃতীয় কন্যাসন্তান। অভাবের ঘরে ঠিক মেনে নিতে পারেন না। 'খাতি পাই না, আবারো দুনিয়াত পোলাপাইন আনলাম'- এমন প্রশ্ন তাকে তাড়িত করে।

কর্মমুখী হওয়ার আশায় আকবর কাউকে কিছু না জানিয়ে টাঙ্গাইল শহরে চলে আসেন। এক মাস পর ডাক যোগে মাত্র পনেরো টাকা পাঠিয়ে দেন। অন্যদিকে লাইলী অনেক কষ্টে থাকার জন্য একটি ঘর তৈরি করেন। ঘরকে কেন্দ্র করেই চলে কন্যাদের নিয়ে রাত্রিযাপন। কিন্তু সেখানেও স্বপ্ন পরিপূর্ণতা পায় না।

লোক মারনফত লাইলী জানতে পারেন, আকবর শহরে গিয়ে রাজনীতি শুরু করেছেন। বিষয়টি তার মধ্যে এক ধরনের খটকার সৃষ্টি করে।। হঠাৎ একদিন লুঙ্গি পরিহিত খালি গায়ে ও বিক্ষিপ্ত চেহারায় আকবর বাড়িতে আসেন। মুহূর্তকালের মধ্যে পুলিশে বাড়ি ভরে যায় এবং অস্ত্র মামলায় তারা আকবরকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারের পর প্রায় দেড় বছর লাইলী থানা-হাজত করে অস্থির হয়ে যান। জেল কর্তৃপক্ষ তার পরিবারকে নিয়মিত রেশন বরাদ্দ দিত। সেই রেশনের কিছু অংশ বিক্রি করে মামলার খরচ চালাতেন।

অনেক চেষ্টার ফলে স্বামীকে মুক্ত করতে সক্ষম হন লাইলী। কিন্তু উদাসীন আকবর ঘরে ফিরে আগের মতই বেখেয়ালী থাকতেন। লাইলীর ভাষায়, 'সংসারে কিছু ফুরাইলেই ঝগড়া অইত। ঘরে যদি আধা কেজি, এক কেজি চাইল থাকত; তাইলেই অইচে কাম, আর কিচুই আনতে চাইত না।' এদিকে সংসারের খরচ থেমে থাকে না। আর্থিক সঙ্কটের মাঝেও চলে মেয়েদের লেখাপড়া। প্রথম ও দ্বিতীয় মেয়েকে তাদের এসএসসি পরীক্ষার পর বিয়ে দিয়ে দেন। তৃতীয় মেয়ে তার লেখাপড়া অব্যাহত রাখে।

প্রতিবেশী এক স্কুল শিক্ষ লাইলীকে শিশু-শিক্ষার উপর পনেরো দিনের একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। প্রশিক্ষণ শেষে একটি স্কুলে যোগদানের সুযোগ হলেও স্বামীর অনিচ্ছার কারণে তা আর সম্ভব হয় নি। তবে থেমে যান নি লাইলী। নিজেই মহিলা অধিদপ্তর থেকে সেলাই মেশিন সংগ্রহ করে টেইলার্সের কাজ শুরু করেন। শুরুতে মাসে গড়ে তিনশ টাকা আয় হত। তবে কিছু দিনের মধ্যে লাইলীর কাজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং তার আয় বেড়ে দাঁড়ায় মাসে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মত। ঘরে বসে উপার্জনেও আকবরের আপত্তি ছিল। মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি– আকবরের এই বিশ্বাসকে লাইলী কোনো ক্রমেই মেনে নিতে পারছিলেন না। ফলে সংসারে অশান্তি সবসময় লেগেই থাকত। এরপরও স্বামীকে কর্মমুখী করে তোলার লক্ষ্যে লাইলী ব্র্যাক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। কিন্তু এতে কোনো লাভ হয় নি। উন্নতির পরিবর্তে ব্যবসার মূলধন নষ্ট করে ফেলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে আকবর শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য লাইলী পুনরায় চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করেন। কিন্তু সব প্রচেষ্টা বিফলে যায়। এক বছর রোগে ভোগার পর আকবর মৃত্যুবরণ করেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েন লাইলী। এক ধরনের নীরব দুঃখবোধ তাকে ঘিরে রাখত। পাশাপাশি ঋণ পরিশোধের বিষয়টি তো ছিলই। ফলে বাসায় বসে সেলাইয়ের পাশাপাশি নতুনভাবে কিছু করার চিন্তা শুরু করেন। বিষয়টি নিয়ে একই গ্রামের মেয়ে মিনু আনোহোলির সাথে কথা বলেন। সবকিছু শোনার পর মিনু আনহোলী তাকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ২০০৩ সালে দিঘুলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠেয় ৬৯৩তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন, অংশগ্রহণকারী ৮০ জন নারীর মধ্যে ধনীর স্ত্রীর সাথে একত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় উপলব্ধি করতে পারি- অর্থের বৈষম্য নয়, মনের বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন। মানুষের চেতনাকে নাড়া দেওয়া, উদ্দীপ্ত করা সহজ নয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট সেই নাড়া দেওয়ার ব্যতিক্রমী কাজটি করে চলেছে। নারীর ক্ষমতায়ন আমাদের জন্য সত্যিকার মাইলফলক। তাই এলাকার মানব সম্পদকে কাজের লাগানোর জন্য অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই আমি। প্রশিক্ষণে অর্জিত অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে, আমি একা নই, অবলম্বন খুঁজে পেয়েছি।

প্রশিক্ষণের মাত্র দুই মাস পরের ঘটনা। লাইলী নিজ গ্রামের ৪০ জন নারীকে নিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহায়তায় একটি দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। প্রশিক্ষণে সেলাই, টাই-ডাই ও ব্লক-বাটিক সংক্রান্ত বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে প্রায় ২০ জন প্রশিক্ষণের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আজ আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন। ২০০৭ সালে ময়মনসিংহ প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক তিন দিনের ফাউন্ডেশন কোর্সে তিনি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লাইলী যেন প্রকৃত অর্থেই জেগে ওঠেন। তার মনে হয়েছে, বিকশিত নারীদের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছে গণ্ডিবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে পুনরায় নিজেকে মেলে ধরার।

'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও কিছু করার চিন্তা করেন লাইলী। নিজের উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন তিনি। প্রথমেই গ্রামের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য নিজ বাড়ির আঙ্গিনা, স্কুল ঘর এবং পাড়ায় বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত উঠান-বৈঠক, আলোচনাসভাসহ নারীর আত্মকর্মস্থানের জন্য নানামুখী কার্যক্রম শুরু করেন। আর এই কার্যক্রমেগুলোতে থাকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি সুন্দর দেশ গড়ার অঙ্গীকার। উঠান বৈঠক ও আলোচনা সভাগুলোতে তিনি বয়স্ক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, যৌতুক ও বাল্যবিবাহের অপকারিতা, এসিড-সন্ত্রাস, সমাজে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব, মাতৃস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া বিভিন্ন দিবস পালনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এলাকায় জনসচেতনতা সৃষ্টি করে চলেছেন। নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি লাইলী ২০০৭ সালে তার এলাকায় সমিতি গঠন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং সামাজিক সচেতনতার জন্য কুড়িটি উঠান বৈঠক করেছেন। আর্থিক সহায়তা করেছেন দশ জন নারীকে। গর্ভবর্তী মায়ের সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। নুশরাত নামে এক কিশোরীকে বাল্যবিবাহের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে কাজের মধ্য দিয়েই পথ দেখিয়ে চলেছেন লাইলী আপা।

এছাড়া নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ৩০ জন নারীকে নিয়ে গঠন করেছেন 'দিঘুলিয়া নারী উন্নয়ন সমিতি' নামের একটি সংগঠন। প্রতি সদস্য সপ্তাহে দশ টাকা করে সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়কৃত অর্থ ব্যংকে জমা রাখা হয়। যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক লেন-দেন সম্পন্ন হয়ে থাকে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলাদের সেলাই ও অন্যান্য সুঁচিকর্ম, পুঁতি দিয়ে নক্সীর কাজ, উল-বুননের কাজসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। লাইলী নিজ উদ্যোগে তার বাড়িতে বর্তমানে আঠারজনকে সেলাই প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এছাড়া রয়েছে চুক্তিভিত্তিক নক্সীকাঁথা ও সেলাইয়ের কার্যক্রম।

অচলায়তন ভেঙে এগিয়ে চলেছেন...

কৈশোরে পছন্দের ফুল চুরির ঘটনায় বাল্যপ্রেমের সূত্রপাত ঘটে। আকবর হাত ধরলে লাইলী প্রথম উপলব্ধি করতে পারেন তিনি নারী! 'লাইলী-আকবর' বিয়ে করেন; অপরিণত্বের মূলও দিতে হয় প্রতি পদে। অতীত কথনে কিছুটা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলেন, মোট তিনটা শাড়ি পাইচি আটাশ বছর সংসার জীবনে; বিয়্যার পরে হেই অইয়্যা গেল এক অন্যরহম মানুষ! পছন্দের মানুষকে বেছে নিয়েও পছন্দের কিছু পাওয়া হয় নি– আগ্রহ ভরে শুনছিলাম জীবনে প্রথম বলতে পারা লাইলী আপার কথাগুলো। দীর্ঘ সময়ের আলাপনের পর একটুখানি হাসি যেন অনেক আশার আলোর সঞ্চার করল। কোনো বাধাই বাধা নয়– লাইলী আপার এই সুন্দর বাক্যটিই তাকে দিয়েছে জীবনকে জয় করে নেওয়ার মহামন্ত্র। নানা কাজে যখন ডেকে পাঠানো হয় এলাকায়; তখন অনুপ্রাণিত বোধ করেন নিজের এরূপ মূল্যায়ন দেখে। ভুলে যান অতীত দিনের সকল দুঃখ। আর এভাবেই বাবার আদরের লালন হয়ে উঠলেন দিঘুলিয়ার লাইলী বেগম। তার প্রচেষ্টায় শতাধিক নারী খুঁজে পেয়েছেন আত্মকর্মসংস্থানের পথ। দেখেছেন আশার আলো। পশ্চিম দিঘুলিয়ার সকলের লাইলী আপা কাজের মধ্য দিয়ে এভাইে অচলায়তন ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছেন; ভবিষ্যতেও তার এই চলা অব্যাহত থাকবে- এমন প্রত্যাশায় ফিরে আসা।

দুর্দান্ত সৈনিকঃ রওশন আরা

সরস্বতী রানী পাল

বহু বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী ভাওয়াল রাজবাড়ী আর রাজদীঘির জন্য খ্যাত জয়দেবপুর। শিববাড়ির মূল সড়ক থেকে পায়ে হাঁটা পথে রাজদীঘির সৌন্দর্য অবলোকন করতে করতে কিছুটা অগ্রসর হওয়া। দীঘির উত্তরপাড়ের শেষ সীমন্তে রয়েছে একটি বাড়ি। বাড়ির নাম ফলকে খোদিত "রওশন মঞ্জিল"। গৃহঅন্দরে প্রবেশ করে নামের মতই রোশনাই অর্থাৎ উজ্জ্বল আলোকিত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ মুগ্ধ করল। রওশন আরার সাংসারিক কর্মটুকু গুছিয়ে নেওয়ার ফাঁকে জানালা দিয়ে দেখছিলাম রাজদীঘির অপরূপ লীলা ও সৌন্দর্য। রওশন মঞ্জিলের স্বত্বাধিকার রওশন আরা আক্তার কাজ শেষে এলেন কথা বলার জন্য; যিনি বিকশিত নারী নেতৃত্বের একজন বলিষ্ঠ নেত্রী হয়ে এলাকায় একনামে পরিচিত হয়ে উঠেছেন রাজদীঘির 'রওশন আপা' নামে।

পেছনের কথা

টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানার ভেড়া ডাকুরী গ্রাম। এই গ্রামের শিক্ষক মৌলভী শমশের আলী ও গৃহিণী নূরজাহান বেগম। তাদের সাত সন্তানের মধ্যে ষষ্ঠ রওশনের জন্ম পহেলা জানুয়ারি, ১৯৬১। বাবা দীর্ঘ চলিশ বছর মসজিদে ইমামতি করেছেন। ফলে এলাকায় মওলানা হিসেবে পরিচিতি ছিল। সে হিসেবে পরিবারে মেয়েদের অবস্থান একটু রক্ষণশীলও ছিল। মা ঘর-সংসারের পাশাপাশি এলাকার ঝগড়া-বিবাদ, বিয়ে শাদি দেয়াসহ সমাজসেবামূলক কাজ করতেন। দুরন্ত প্রকৃতির রওশনের স্বভাব এবং গড়ন সবই ছিল বাবার মত। মায়ের সমাজসেবা দেখে শৈশবে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নচারী রওশনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ভেড়া ডাকুরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পড়ার ফাঁকে সব বিষয়ে আগ্রহী রওশন বড় বোনের কাছে সেলাই শিখতেন। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় 'প্রগতি নারী সংঘ' নামে একটি সংগঠন থেকে বাঁশ, বেত ও সেলাইয়ের কাজ শেখেন এবং দুটি মেশিন অনুদান পান।

বর্তমানকে দেখা

বৃত্তি পাওয়া মেধাবী রওশনের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। মৌলভী পরিবারের মেয়ে পর্দাশীল হবে এবং ঘরেই থাকবে। এরূপ কথাকে পেছনে ফেলে রওশন তার পড়াশুনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ী হন। পারিবারিক অসম্মতিকে উপেক্ষা করে রওশন ভর্তি হন হাই স্কুলে। বড় দুলাভাই এক্ষেত্রে তাকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। ঝাওয়াইলে বোনের বাসায় অবস্থান করে রওশন ১৯৭৬ সালে 'ঝাওয়াইল গালর্স স্কুল' থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাশ করেন। ফলাফল প্রকাশের দুই দিন পর বাবার মৃত্যুতে রওশন বাড়িতে আসেন। বাবার মৃত্যুর ফলে পরিবারটি অনেকটাই অভিবাবকহীন হয়ে পড়ে এবং রওশনের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিছুটা সময় অনিশ্চয়তায় পার করেন। কিন্তু পড়াশুনা করতেই হবে– এই মানসিকতাই তাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। প্রচণ্ড অভিমানী রওশন জেদ ধরেন। চলে আসেন ভাইয়ের বাসায়। সংগ্রামী রওশন তার পড়াশুনা অব্যাহত রেখে নানা প্রতিকূলতার মাঝেও 'পাবনা মহিলা কলেজ' থেকে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাশ করেন ১৯৭৮ সালে। উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকার আসেন এবং মিরপুরের দক্ষিণ বিশিলে ভাইয়ের বাসায় ওঠেন। এসময় তিনি উচ্চ শিক্ষার খোঁজের পাশাপাশি

কম্পিউটার, ইংরেজি ভাষা এবং বিউটিফিকেশনের কাজ শেখেন। ভাইয়ের ব্যসায়িক সূত্রে পরিচিত বন্ধু মিরপুরের বাসিন্দা বেনজীর আহম্মদ প্রায়ই তাদের বাড়িতে আসত। সেই সুবাদে বোনের ভর্তির বিষয়টি তাকে জানানো হলে তিনি রওশনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করেন।

চলমান ঘটনাক্রম

১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ সাল। এই সময়কালে রওশন স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। মাঝে ঘটে যায় জীবনের উত্থান-পতনের নানা ঘটনাও। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির এক বছরের মধ্যে রওশন বেনজীর আহম্মদকে বিয়ে করেন এবং পুত্র সন্তানের জননী হন। এ সময় তিনি শামসুন্নাহার হলের আবাসিক ছাত্রী হিসেবে অবস্থান করতেন। তবে মিরপুরে ভাইয়ের বাসা ও শ্বশুরবাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। রওশনের ভাষায়, সেই সময় বিয়ের ঘটনাটি কেউ জানত না। পরে যখন দুই বাড়িতে জানাজানি হয় তখন এ নিয়ে বেশ তোড়জোড় শুরু হয়। তবে মাত্র অল্প কয়েকদিন সময়ের ব্যবধানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

১৯৮৪ সালে রওশন তার শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রডাক্টশন ডিরেক্টর পদে যোগদান করেন। মাসিক বারো হাজার টাকা দিয়ে রওশন শুরু করেন তার কর্মজীবন। ছয় বছর কাজ করে ১৯৯০ সালে তার বেতন হয় পনের হাজার টাকা। রওশন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আফগানিস্থান, সোমালিয়া, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে ঘুরে তৈরি পোশাক, স্বাস্থ্যসেবা, এইচআইভিসহ অনেকগুলো বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অভিজ্ঞ হওয়ার সুযোগ পান। কিন্তু হঠাৎ করেই তাকে চট্টগ্রামে বদলি করা হয়। কিন্তু সংসার ও সন্তানের কথা ভেবে চাকরি চেড়ে দেন এবং স্বামীর সহযোগিতায় 'সেভ দ্য ডিসট্রেস পিপল (এসডিপি)' বা 'বিপন্নকে বাঁচাও' নামে দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলেন।

ঢাকার খিলগাঁওয়ে ১৯৯০ সালে ৩৫ জন মহিলা সদস্য নিয়ে গড়ে তোলা এই সংগঠনের মাধ্যমে রওশন গণশিক্ষা, সেলাই প্রশিক্ষণ, সুচিকর্ম, টাইপিং, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা, পশুপালন প্রভৃতি কার্যক্রম হাতে নেন। শুরুতে গণস্বাস্থ্যের সহযোগিতায় তিনি মাত্র দুই টাকার বিনিময়ে কর্ম এলাকার দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে শুরু করেন। খিলগাঁও এলাকায় দীর্ঘদিনের পানি সমস্যা নিরসনে অন্যতম ভূমিকা পালন করেন রওশন আরা। ১৯৯২ সালে রোটারী ক্লাব অব ঢাকা নর্থের উদ্যোগে এবং এসডিপি-এর সহযোগিতায় 'বস্তির পানি সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ' গ্রহণের বিষয়টি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক সাড়া জাগায়। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে রওশন এসডিপি ছেড়ে দেন। ঘরে বসে রওশনের সময় যেতে চাইত না। এ সময়ে তিনি স্বামীর ব্যবসায়িক সূত্র ধরে চলে আসেন গাজীপুরের চান্দনায় এবং সেখানে স্বামীর সাথে দুই বছর অবস্থান করেন।

দীর্ঘ ষোল বছর পর রওশন দ্বিতীয় সন্তানের জননী হন। কন্যাসন্তানের আগমনকে কেন্দ্র করে পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। এরপর তাদের নতুন বসতি গড়ে ওঠে রাজদীঘির উত্তরপাড়ে। এদিকে ঘর-সংসারের মাধ্যমে জীবনের বেশ কিছুটা

সময় গড়িয়ে যায়। নতুন করে কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করেন। স্বামীর সাথে পরামর্শ করে এলাকার বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হন। ফলে খুব দ্রুত এলাকায় রওশনের পরিচিতি বাড়তে থাকে।

গাজীপুরে নারী নির্যাতন বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনে রওশন সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সমাজসেবামূলক এই কাগুলোর সুবাদে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্নপ্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সাথে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। এরই সূত্র ধরে উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তার মাধ্যমে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এবং উজ্জীবক প্রশিক্ষণের কথা জানতে পারেন। উজ্জীবকদের সেচ্ছাশ্রমের বিষয়টি তাকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি মনে মনে প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ২০০৩ সালের জুন মাসে উপজেলা মিলনায়নে অনুষ্ঠিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে ঘরে ফিরে রওশনের মনে হয়েছে, উজ্জীবকদের মাঝে যে উদ্দীপনা তার শেষ নেই। এটি জেগে থাকলে ব্যক্তি নিজেই নিজের পথ গড়ে তুলতে পারে।

প্রশিক্ষণ থেকে ফেরার পর রওশনের কাজের কাজের পরিধি বেড়ে যায়। স্বামীর অনুপ্রেরণায় গড়ে তোলেন একটি সংগঠন। পূর্বে ঘরোয়াভাবে গড়ে তোলা সমিতিটি 'সূধী জনকল্যাণ সমিতি' নামে আত্মপ্রকাশ করে। ৫০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে নারীর ব্যক্তি অধিকার নিশ্চিতকরণ, নারীর প্রতি সহিংসতা ও সকল প্রকার বৈষম্য রোধ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেন। এছাড় মানবাধিকার, পরিবেশ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়েও তারা কাজ শুরু করেন।

সে বছরই রওশন যুক্ত হন নারীপক্ষের ৫৫০টি সংগঠন নিয়ে গঠিত প্রকল্প দুর্বার নেটওয়ার্কের সাথে। এই নেটওয়ার্ক দিয়েই রওশন আরা বেশি পরিচিতি পেয়েছেন। তার ভাষায়, দুই বছর সময়ে গাজীপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে সহ-আহ্বাহিকার দায়িত্ব পালন করি। বর্তমানে 'ঢাকা-মানিকগঞ্জ-নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী-মুন্সিগঞ্জ-গাজীপুর' এই ছয়টি এলাকা নিয়ে গঠিত একটি অর্থাৎ ঢাকা অঞ্চলের 'সভানেত্রী'র দায়িত্ব পালন করছি। উল্লেখ্য, সারা বাংলাদেশে মোট অঞ্চলের সংখ্যা ১৬টি। ১৬টি অঞ্চলের ১৬ জন নারী প্রতিনিধির আমিও একজন– এই কথাটি ভাবতে ভালো লাগে এবং গর্ববোধ করি।

সেপ্টেম্বর, ২০০৬, রওশন তার কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য যুক্ত হন বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সাথে। রাজবাড়ীতে অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্বের বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্সের দ্বিতীয় ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণটি গ্রহণের পর তিনি উপলব্ধি করেন, আমাদের সমাজের নারীরা এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

নারীরা ঘরে বাইরে সর্বস্তরে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই তিনি এলাকায় বলিষ্ঠভাবে শুরু করেন তার কার্যক্রম। এ পর্যন্ত নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য নারী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৩৭ জন নারী ও ৯৭ জন পুরুষকে নিয়ে কর্মশালা, উঠান-বৈঠক এবং আলোচনা সভা করেন। এছাড়া পারিবারিক নির্যাতন বন্ধের দাবীতে বিভিন্ন পেশাজীবীর সাথে মত বিনিময় করেন। তিনি তার কর্ম এলাকায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিও গড়ে তুলেছেন। তার এ ধরনের পদক্ষেপের কারণে আজ বহু নারী তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। এছাড়াও তিনি গাজীপুর প্রতিনিধি হিসেবে টিআইবি, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র, পরিবেশ উন্নয়ন কেন্দ্র, আইন-শৃঙ্খলা কেন্দ্র এবং জেল-পরিদর্শক হিসেবে কাজের সাথে যুক্ত রয়েছেন।

যেখানে সমস্যা সেখাইে সোচ্চার রওশন আরা

গাজীপুর কৃষি গবেষণাগারের কর্মকর্তা হাসিনা বেগম তার বাসার গৃহকর্মী রেখাকে নিমর্মভাবে নির্যাতন করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে সিরারেট ও মোমের আগুন দিয়ে ঝলসে দেয়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে এলাকার লোকজন গাজীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু হাসপাতালে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘ চার মাস চিকিৎসাধীন থেকে রেখা সুস্থ হয়। এদিকে ঘটনার দিন সমস্ত ঘটনা শুনে সূধী জনকল্যাণ সমিতির সভানেত্রী রওশন আরা মহিলা অধিদপ্তরের জেলা কর্মকর্তা এবং অন্যান্য

স্থানীয় সংগঠন মিলে তাৎক্ষণিক আসামীদের গ্রেফতারের জন্য গাজীপুর শহরে প্রতিবাদ সভা করেন। এরপর কর্মসূচি হিসেবে গাজীপুর শহরের মুক্তমঞ্চে প্রতীকী অনশন করেন এবং আসামীদের অবিলম্বে ধরার জন্য ডিসি ও এসপি-এর নিকট স্মারকলিপি দেযা হয়। পনের দিনের মধ্যে হাসিনা এবং তার স্বামী গ্রেফতার হয়। দীর্ঘ দেড় বছর জেলে থাকার পর জামীনে বের হন। দীর্ঘ চার বৎসর পাঁচ মাস পর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতের জজ মামলাটির রায় ঘোষণা করেন। হাসিনাকে দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও হাসিনার স্বামী শাহজাহানের পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সক্রিয় ও বলিষ্ঠ নারীনেত্রী রওশন মনে করেন, মামলার রায় গৃহকর্মীদের নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক ও নির্যাতনকারীদের জন্য সতর্ক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।

দুর্দান্ত সৈনিকের দুরন্ত পথ চলা

যেখানে নির্যাতন সেখানেই রওশন আরার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। সমাজকল্যাণ ও নারী নেতৃত্বর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং নারীদের জন্য কাজ করতে সক্ষম হয়ে ওঠার জন্য স্বামীর ভূমিকাকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। জীবনের শুরুতেই তিনি পেয়েছেন একজন সহকর্মী এবং প্রকৃত বন্ধুর পূর্ণ সহযোগিতা। মওলানা ভাসানীর আদর্শের সৈনিক স্বামী বেনজীর আহম্মদের সর্বাত্মাক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা না পেলে নেতৃত্ব প্রদান করা সম্ভব হত না বলে মনে করেন তিনি। ‘বাংলাদেশের নারীরা এখনও পিছিয়ে আছে। নানা ক্ষেত্রে নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। নির্যাতন মুক্ত করতে নারীর উন্নয়নের সাথে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা। পিছিয়ে পড়া নারীরা জেগে উঠবে। অধিকার বাস্তবায়িত হবে। সম-অধিকার নিয়ে এগিয়ে যাবে’– এমনটি প্রত্যাশা করেন রাজবাড়ীর উত্তরদীঘিপাড়ের নারী নেত্রী রওশন আরা।

সংগ্রামী শাহানা

সরস্বতী রানী পাল

মাদারীপুর জেলা শহরের অদূরে পানিছত্র এলাকার একটি বাড়ির নাম 'নিরিবিলি'। বাড়ির নামের ঠিক বিপরীত স্বভাবের অর্থাৎ দূরন্ত প্রকৃতির কিশোরী শাহানা তার শৈশব স্মৃতির অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছেন এই বাড়িতে। অতীত স্মৃতিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন জীবন চলার পথে। কখনও সফল হয়েছেন আবার ব্যর্থতার ইতিহাসও কম নয়। কিন্তু তাতে জীবন তো আর থেমে থাকে না। ষাটের দশকে জীবন শুরু করা মাদারীপুরের সংগ্রামী নারী শাহানা শৈলীর পেছনের কথাগুলো ছিল এরকম:

প্রাক্‌কথা

শাহানার জন্ম ২৯ ডিসেম্বর ১৯৬১ সালে, মাদারীপুর জেলা শহরে। পিতা মোঃ এনায়েত উল্লাহ জজ কোর্টে চাকরি করতেন। মা বেগম হাফিজা ছিলেন গৃহিণী। পরিবারে নয় ভাই-বোনের মধ্যে শাহানা সপ্তম। মাদারীপুরের পুরাণ টাউনে জন্ম হলেও পানিছত্র শহরতলীতে শাহানা বেড়ে উঠেছেন এবং তার শৈশবের স্মৃতিময় দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন। মাদারীপুর পৌরসভা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শাহানার পড়ার সময়টা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক উত্তাল। চতুর্থ শ্রেণিতে মাত্র চারদিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিছুদিন পানিছত্র শহরতলীতে, আবার কখনও গ্রামের কোনো অপরিচিত বাড়িতে পরিবারের সবার সাথে শাহানা কোনোক্রমে বেঁচে ছিলেন। যুদ্ধের সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি তার কাছে আজও দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

বয়ে চলা সময়ের কথা

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পরিবারের সদস্যদের সাথে শাহানা নিজ বাড়ি পানিছত্রের নিরিবিলিতে ফিরে আসেন। ডনোভান সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষায় ফলাফল শাহানাকে অনেক বেশি উৎসাহিত করে। ১৯৭৭ সালে ডনোভান সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ১৯৭৯ এবং ১৯৮২ সালে সরকারী নাজিমুদ্দীন কলেজ থেকে যথাক্রমে এইচএসসি এবং বিএসসি পাশ করেন। বাবার ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে ভর্তি হন কুষ্টিয়া আইন কলেজে। বড় ভাইয়ের কর্ম সুবাদে তার এই কুষ্টিয়াতে পড়তে আসা। মেডিকেলের ছাত্রী ভাইঝিকে নিয়ে ভাই-ভাবীর ছুটাছুটির প্রভাব পড়ে শাহানার উপর। এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি পানিছত্রে ফিরে আসেন। পানিছত্র গ্রামে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যে বাবার সিদ্ধান্তে আইন পড়ার জন্য নারায়ণগঞ্জে আসেন। এখানে ফুফুর আগ্রহে তার বাসায় থাকা এবং নারায়ণগঞ্জ আইন কলেজে পড়ার পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ড ও সাহিত্য চর্চার সাথে যুক্ত হন। ১৯৮৪ সালে এলএলবি প্রথম পর্বে এবং ১৯৮৫ সালে চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মাদারীপুর জজ কোর্টে একজন জুনিয়র আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন শুরু করেন। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে এডভোকেটশীপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মাদারীপুর জেলা জজ আদালতে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

১৯৮৭ সালে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরির সুযোগ ঘটে একজন আর্থ-সমাজবিদ হিসেবে। এখানে কর্মসূত্রে পরিচয় ঘটে এক সহকর্মীর সাথে। সহকর্মী থেকে সম্পর্ক বন্ধুত্বে গড়ায় এবং সেই সূত্র ধরে ১৯৮৮ সালের ২৩ এপ্রিল তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এগিয়ে চলার শাহানার পদযাত্রার সাথে ঘটে নব সংযোজন। শাহানা তার স্বপ্নের মত ঘরে নতুন প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করলেন। স্বামী প্রশিক্ষক হিসেবে জঁৎধষ ঊসঢ়ষডুসবহঃ ঝবপঃড়ৎ চৎড়মৎধস (জঊঝচ মাদারীপুরে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু স্বামীর কাজের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যায় তাই তারা কর্মসুযোগের সন্ধানে ঢাকায় আসেন। স্বামীর সাথে ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার শ্যামলীতে ভাড়া বাসায় ওঠেন।

১৯৯০ সালের ১১ মার্চ প্রথম পুত্র সন্তানের জননী হন। পুত্র ঐশীকে নিয়ে বর্তমান সময় ভাল গেলেও তার জন্মের পূর্বের কথাগুলো শাহানা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, "ঐশী গর্ভে থাকার সময় ওর বাবা বেশির ভাগ সময় বাইরে থাকতেন। কোনোরূপ খোঁজখবর তো দূরে থাক সামান্য সৌজন্যটুকুও করতেন না। সন্তান জন্ম হওয়ার সম্ভাব্য তারিখের একমাস পূর্বে জানা গেল স্বাভাবিকভাবে নয় অপারেশনের মাধ্যমে জন্ম হবে। নিজের কিছু জমানো অর্থ নিয়ে মোটামুটি প্রস্তুতি নিলাম। একা একা কি করব, কে আমাকে সময় মত হাসপাতালে নিয়ে যাবে– ইত্যাদি নানা কথা ভেবে চিকিৎসকের পরামর্শে নির্দিষ্ট সময়ের দশ দিন আগে পিজি হাসপাতালে চলে গিয়েছিলাম। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আট দিন পর পূর্বের সংগৃহীত অর্থ থেকে বিল পরিশোধ করলাম। ফিরে আসার মুহূর্তে স্বামী হাসপাতালে গিয়েছিলেন মাত্র অল্প কিছু সময়ের জন্য।" ঘরে ফিরেও স্বস্তি মিলল না শাহানার। বাসা ভাড়া এবং সংসারের খরচ সব শাহানার সঞ্চিত অর্থ থেকে চলছিল। খুব দ্রুত তার সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে যায়। ফলে চাকরি খুঁজতে শুরু করেন শাহানা।

নতুন কর্মপথ

১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন ঞৎব উবং ঐড়সবং (ঞঊঐ)- এ। ঢাকার বস্তিবাসী শিশুদের নিয়ে শাহানা এই জীবিকার কর্মপথটি খুঁজে পান। ১৯৯৬ ডিসেম্বর আইন ও সালিশ কেন্দ্রে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে শাহানা বলেন, 'টিডিএইচ-এ শিশুদের নিয়ে প্রকল্পের নির্দিষ্ট কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেড় মাস ঘরে বসে অনিশ্চিত সময় কাটে। একদিন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেখে চাকরির জন্য আবেদন করি। পনেরো দিন পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে আইন ও সালিশ কেন্দ্রে কর্মসুযোগ ঘটে। এরপর ইধহমষধফবংয ঘধঃরড়হধষ ডড়সবহুং খধুবিৎ অংংড়পরধঃরড়হ (ইডখঅ) চৎড়লবপঃ-এ খধুবিৎ হিসেবে কাজ শুরু করি। মানুষের জন্য প্রকল্পে পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে বিভিন্ন নির্যাতনের উপর এই কর্মসুযোগ শাহানাকে বিচিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তোলে। বর্তমানে মাদারীপুর কোর্টে আইন পেশা অনুশীলনের পাশাপাশি ফ্রিল্যান্স ট্রেনিং কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়া সকল ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সোচ্চার থাকেন। প্রস্তুত থাকেন যে কোন পরিস্থিতিতে কিছু করার জন্য।

ঘুরে যায় জীবনের কথা

অবিশ্রান্ত যাত্রাপথে কর্মজীবনের সাথে সংসার জীবনও চলছিল। কিন্তু সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর ঘরে ফিরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করতেন। বিবাহিত জীবনের আট বছর সময় কেটেছে তাদের। তারপর থেকে এক ধরনের অলিখিত বিচ্ছেদ চলছিল যেন। বহু দিন স্বামী কোনো খোঁজ নেয় নি তার। দীর্ঘ দিনের অপেক্ষা ছিল স্বামী ফিরে আসবে। জীবনের এই অলিখিত বিচ্ছেদের টানপোড়নের জীবন থেকে স্বস্তি পেতে শাহানা কঠিন সিদ্ধান্ত নেন। কাগজে কলমে ২০০৪ সালে বিবাহ বিচ্ছেদ নিলেন। বিবাহ বিচ্ছেদের এক বছর পর সিদ্ধান্ত নিলেন একাকীত্বের এই জীবন আর নয়। ফিরে যাবেন মাদারীপুরে। সেখানে পরিবারের সবার সাথে থাকবেন এবং গ্রামের জন্য কিছু করবেন। তাই ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে ছেলেকে নিয়ে মাদারীপুরে চলে আসেন। এখানে শুরু করেন কর্মজীবন।

২০০৫ সালের মাঝামাঝি সময় 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক', মাদারীপুর জেলা কমিটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে শাহানার সাথে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের পরিচয় ঘটে। সুজন-এর মাদারীপুর কমিটির সচেতন নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন

কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। যশোর রামনগর আরআরএফ ট্রেনিং রিসোর্স সেন্টারে আয়োজিত তিন দিনের এই প্রশিক্ষণে তিনি খুঁজে পান সমাজে নারীর নতুন রূপ। শাহানার ভাষায়, নানা জেলা থেকে আগত এক সাথে অনেক নারীর সমন্বয় নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার। প্রাক-ভারত উপমহাদেশে নারীর ক্রমাগত নেতৃত্বের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হতে পেরে জানার দ্বার অবারিত হয়েছে। সংগ্রামের ক্ষেত্রে যুগে যুগে নারীই যে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে এটিই সবচেয়ে ভালো লাগা ছিল।

স্বেচ্ছসেবী হিসেবে আরও সক্রিয় কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে শাহানা ২০০৬ সালের ৩১ জুলাই ৯৭৮তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মাদারীপুর বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে আয়োজিত প্রশিক্ষণের বিভিন্ন সেশনে ছিল শৈলীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। প্রশিক্ষণে শাহানা একটি ব্যতিক্রমী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তা হচ্ছে তিনি একইসাথে অংশগ্রহণকারী ও সহায়কের দ্বৈত ভূমিকা পালন করে প্রশিক্ষণে সবার মনযোগ কেড়ে নেন।

আইনি পরামর্শ, জেন্ডার ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়গুলো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শাহানার ভাষায়, 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণের ফলে অর্জিত দক্ষতা দ্বিগুণ করে দিল আমার আত্মবিশ্বাস, নতুন করে যেন ফিরে পেলাম নিজেকে। প্রশিক্ষণের পর শাহানা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সচেতন কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত করেছেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি এলাকায় বেশ পরিচিতি লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ব্যক্তিগত কর্মব্যস্ততার কারণে এলাকায় প্রায় হারিয়েই গিয়েছিলাম; কিন্তু বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর অনেকেই আমাকে নতুন করে খুঁজে পায়।' এলাকাবাসী জানতে পারে তার নারীর অধিকার আন্দোলনের বিষয়টি। শাহানা একজন আইনজীবী হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা কয়েকগুণ বাড়িয়ে তোলেন। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তিনি নির্যাতিত দরিদ্র ও দুঃস্থ নারীদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দিতে শুরু করেন। নিম্নে এরূপ কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল:

এক, মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার কমলাপুর গ্রামের হেলিয়া বেগমের সাথে একই গ্রামের শের আলী খানের সাথে ত্রিশ বছর পূর্বে বিয়ে হয়। বর্তমানে চার সন্তানের জননী এবং ইতোমধ্যে বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। স্বামী শের আলী খান ২০০৪ সালে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আরও একটি বিয়ে করেন। বিয়ের পর থেকেই তিনি হেলিয়াকে যৌতুকের দাবিতে নিয়মিত নির্যাতন করেন। ২০০৫ সালে হেলিয়া স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করলে স্বামীর বোন হেলিয়ার বিরুদ্ধে দু'টি চুরির মামলা দায়ের করেন এবং সেই মামলায় হেলিয়া ১০ দিন হাজত বাস করেন। হেলিয়া মামলা করলেও অর্থাভাবে তার পক্ষে কোন উকিল ছিল না। ২০০৬ সালে আদালতে শাহানর সাথে হেলিয়ার পরিচয় ঘটে। তিনি বিষয়টি জানতে পারেন এবং ৬ বছরের ছেলেসহ হেলিয়াকে তার বাড়িতে আশ্রয় দেন। পরে শাহানা হেলিয়ার পক্ষে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করেন। ইতোমধ্যে তিনি তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা দু'টি থেকে খালাশ পেয়েছেন। অন্যদিকে স্বামী শেরে আলী খান এক মাস হাজত খেটে বর্তমানে জামিনে রয়েছেন।

দুই, মাদারীপুরের মুন্নীর সাথে ঢাকার সোহেলের ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সূত্রে তারা ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং চট্টগ্রামে এক মাস অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে মুন্নীর বাবা অপহরণের মামলা দায়ের করলে সোহেল-মুন্নীকে গ্রেফতার করা হয় এবং মুন্নীকে নিরাপদ হাজতে রাখা হয়। মুন্নীর বাবা মেয়েকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক দাবি করলে আদালত মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং তাকে শৈলীর তত্ত্বাবধানে রাখেন। শাহানা নিজ তত্ত্বাবধানে রেখে মুন্নীর ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন করেন এবং রিপোর্টে মুন্নী প্রাপ্ত বয়স্ক বলে প্রমাণিত হয়। ফলে সোহেল জামিন পায়। বর্তমানে মুন্নী ও সোহেল ঢাকাতে বসবাস করছেন এবং ইতোমধ্যেই একটি পুত্র সন্তান এসেছে তাদের পরিবারে।

তিন, চুয়াডাঙ্গার নুরিয়া বেগম বোনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার সময় মাদরীপুরের মোস্তফাপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। পুলিশ তাকে ফেনসিডিলের বাহক সন্দেহে গ্রেফতার করে। নুরিয়ার পক্ষে কোন আইনজীবী না থাকায় তাকে দীর্ঘ ১১ মাস হাজতবাস করতে হয়। এসময় পরিবারেরও কেউ তার খোঁজখবর নেয় নি। কোর্ট ভিজিট করতে গিয়ে শৈলীর সাথে নুরিয়ার কথা হয়। কোর্ট থেকে অনুমতি নিয়ে শাহানা নুরিয়ার মামলাটি পরিচালনা করেন। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। নুরিয়ার পক্ষের আইনজীবী হিসেবে কাজ করছেন শাহানা। মামলার তারিখ পড়লে নুরিয়া চুয়াডাঙ্গা থেকে মাদরীপুরে শাহানার বাসায় আসেন এবং সেখানে অবস্থান করে মামলার হাজিরা দিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে যান। বর্তমানে শাহানার পরামর্শে নুরিয়া তার এলাকায় স্বাবলম্বী জীবনযাপন করছেন।

চার, ২০০৬ সালে মাদারীপুর উকিল পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা দীপালির স্বামী সাংসারিক কলহের জের ধরে নির্যাতনের মাধ্যমে স্ত্রীকে হত্যা করেন। কিন্তু তিনি একে আত্মহত্যা বলে প্রচার করেন। পুলিশ বাদী হয়ে থানায় মামলা করে। অন্যদিকে দীপালি নিজে আত্মহত্যা করে নি বরং স্বামীই তাকে হত্যা করেছে- এই প্রতিবাদে এলাকায় শাহানার নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। ফলে ব্যাপক সাড়া পড়ে। দীপালির মৃতদেহ ময়না তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সবাই তার বিরোধিতা করে। এই মামলার প্রতিবাদ এখনও অব্যাহত রয়েছে।

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-মাদারীপুর জেলা কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে প্রচারাভিযান ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজ অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া, মাদারীপুরের সচেতন নাগরিক কমিটি, টিআইবি'র সদস্য, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন এবং মাদারীপুর লিগেল এইড এসোসিয়েশন কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। নানামুখী কর্মব্যস্ত তার মাঝেও বিভিন্ন জায়গায় আইনজীবী হিসেবে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সংগ্রামী শাহানার ভাষায়, 'ভবিষ্যতে এমন কর্মক্ষেত্র তৈরি করব যেখানে সমাজে নির্যাতিত নারীর আশ্রয় ও কাজের সুযোগ থাকবে। এছাড়া পুত্র ঐশী একজন প্রকৃত মানুষ হবে' এই স্বপ্নটুকু লালন করেন অনেক কর্মব্যস্ততার ভীড়েও।

সংগ্রামী চলার শেষ কথা

জীবনপ্রেমী, আত্মবিশ্বাসী-অবিশ্রান্ত জলধারার মতো কান্না ব্যাকুল এক সলাজ মানবী শাহানা শৈলী। তিনি মাদারীপুর বার এসোসিয়েশনে আইন পেশা দিয়ে কর্ম জীবন শুরু করেন। শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বরাবরই শৈলী খেলাধুলা, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক, গল্পবলা, রচনা প্রতিযোগিতা ও অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কৃতিত্বে যুক্ত হয়েছে পর পর তিন বার (১৯৮৬, '৮৭, '৮৮) জেলা পর্যায়ে 'একুশে সাহিত্য' পুরস্কার। উত্তরবাংলা লেখক সম্মেলন, ২০০৭ উপলক্ষে সাহিত্যাঙ্গনে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের জন্য গাঙচিল সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ তাকে সম্মাননা প্রদান করে। জানুয়ারি, ২০০৮ রাজশাহীতে 'মহিউদ্দিন আহম্মদ স্মৃতি গাঙচিল সাহিত্য পদক' গ্রহণ করে শাহানা তার সাহিত্য সাধনায় ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছেন। এছাড়া চলতি বছর খুলনা সাহিত্য একাডেমি পদকের জন্য তাকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তার রচিত গ্রন্থ 'অবিশান্ত পদযাত্রা' প্রশংসিত হওয়ার পর দ্বিতীয় কবিতার বই 'সুখের কষ্টে ভাসায় যে জন' প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। শিক্ষা জীবনে যেমন, কর্ম জীবনে এসেও তেমনি পেশার পাশাপাশি নেশার মতো সমাজসেবা এবং মানবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছেন। তার নুয়ে না পড়ার এক অনবদ্য দীক্ষা, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর তীক্ষ্ণ অন্বেষা বারবার পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় জীবন সংগ্রামে এগিয়ে চলার কথা।

রাশিদা: অবিচল পথিক

সরস্বতী রানী পাল

দুই অক্ষরের একটি ছোট্ট শব্দ 'নারী'। অজস্র বাঁধায় জর্জরিত আর প্রতি পদেই সতর্কবাণী আরোপিত জগৎ সংসারে নারী নিজ ইচ্ছায় চাইলেই কিছু করতে পারে না। পারে না স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে। জন্মসূত্রেই যেন সে জীবনে কিছু ভোগান্তিকে স্বাগত জানায়। বড় হতে হতে বাঁধার প্রাচীর ভেঙ্গে তাকে পথ চলতে হয়। কথাগুলো শুধু কোনো এক বিশেষ নাম বা নারীর ক্ষেত্রে নয়; বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র নারীর জন্যই কম-বেশি প্রযোজ্য। নানা প্রতিবন্ধকতায়ও নারী তার জীবনে এক অবিচল পথিক। সেই পথিকেরই একজন সংগ্রামী নারীর পথচলা– ময়মনসিংহের রাশিদা আক্তার।

কৃষক সাহেব আলী তার স্ত্রী হালিমা বেগম ও তিন কন্যাসন্তানসহ নন্দীগ্রাম গ্রামে বসবাস করতেন। পর পর তিনজন কন্যা! বিষয়টি এলাকার মাথাব্যথা হলেও পরিবারে এ নিয়ে কোনো প্রকারের টু-শব্দটি ছিল না। ফলে মেয়ে হয়ে জন্মানোর খেসারত দিতে হয় নি তাদের কাউকেই। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান রাশিদার জন্ম ১৯৬৮ সালে। নাগরা গ্রামের 'রাঘববাড়ি' মামার বাড়িতে কেটেছে রাশিদার শৈশবস্মৃতির বেশ কিছুটা সময়। বড় দুই বোনের বিয়ের পর রাশিদা রসুলপুরে মায়ের কাছে চলে আসেন। স্কুল দূরে ছিল বলে রসুলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। রাশিদা সুশ্রী ছিলেন বলে কারণে অকারণে বিয়ের প্রস্তাব আসত। তাই আদরের ছোট কন্যাকে বিপদমুক্ত রাখার জন্য পড়ানোর পরিবর্তে ঘরে রাখতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন তারা। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হলেও নিজ আগ্রহে ঘরে বসেই তিনি লেখাপড়া অব্যাহত রাখেন।

বার্ধক্যজনিত কারণে রাশিদার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে সংসারের মূল দায়িত্ব বর্তায় বড় জামাইয়ের উপর। আর্থিক প্রয়োজনে দুলাভাই রাশিদাদের বসতবাড়ি বিক্রি করেন। ময়মনসিংহের লক্ষ্মীখোলায় রাশিদার বড়বোনের শ্বশুরবাড়ির কাছে নতুন করে বাড়ি করেন। বসতবাড়ির পাশাপাশি কৃষি জমির বেশ কিছু অংশও বিক্রি করেন। তবে এসব ঘটনার অনেকটাই রয়ে যায় রহস্যময়! দুলাভাই তার মত করেই বিষয়গুলো পরিচালনা করতেন। ফলে ঘটনার অন্তরালের বিষয়গুলো নিয়ে কারো কিছু বলার সুযোগ ছিল না।

পুতুলখেলার শৈশবে মেয়ে পুতুলের বিয়ে দিলেও কখনও নিজের বিয়ের কথা ভাবতেন না রাশিদা। মায়ের নানা গুণে মুগ্ধ হয়ে দেখতেন চিড়া-মুড়ি-খই-কুটা, ঢেঁকিতে ধান ভাঙানো, পিঠা বানানো। নিজেও মাকে সহায়তা করতেন। নানা আলাপনে এক সময় মা-মেয়ে বন্ধু হয়ে ওঠতেন। কিন্তু ততদিনে সোনালী শৈশব-কৈশোর উত্তীর্ণ রাশিদার সময় হয় পরকে আপন করার। দুলাভাইয়ের পছন্দে রাশিদার বিয়ে ঠিক হয়। বিয়েতে মায়ের বেশ আপত্তি ছিল। আরও কিছুদিন পর, একটু বুঝেশুনে, ভালো পাত্রের কাছে আদরের ছোট মেয়েকে বিয়ে দিবেন তিনি। কিন্তু তা শুধু স্বপ্ন হয়েই রয়!

পারিবারিক সম্মতিতে সামাজিকভাবে রাশিদার বিয়ে সম্পূর্ণ হয় ব্যবসায়িক পাত্রের সাথে। যৌতুকবিহীন প্রথম সন্তানের বিয়েতেই শূন্য! এমন প্রশ্নে অভিমানী শাশুড়ি পুত্রবধূকে মেনে নিতে পারলেন না। রাশিদার সবকিছুতেই শাশুড়ির থাকত ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ। জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে যাকে ভাবা যায় তিনিই হলেন বিড়ম্বনার বড় কণ্টক। রাশিদার ভাষায়, মায়ের

অভিমানী গুণটি পোলায়ও যেন উত্তরাধিকারসূত্রে পাইচিল; জীবনে কোনো দিন সুখ পাই নাই!' শ্বশুর এ ব্যাপারে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করতেন না। তবে ছেলের বউকে তিনি ভালোইবাসতেন এরূপ কথা বলতে দ্বিধা নেই রাশিদার। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল পনের। বিয়ের পরে জন্ম এক ননদ ও এক দেবরকে নিঃস্বার্থভাবে নিজের ভাই-বোনের মতই যত্নে মানুষ করেছেন দায়িত্বশীল রাশিদা। সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে রাশিদার মনে পড়ত বাবারবাড়ির সুখকর স্মৃতিগুলো। কিন্তু পরের ঘরে এসে ধীরে ধীরে তিনি অভিজ্ঞ হওয়ার সুযোগ পেলেন সেসকল কিছুরই! গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগী পালন, পানি তোলা, রান্না করা, সবাইকে পরিবেশন করা– এসবই ছিল বড় বউয়ের দায়িত্ব। কাজের ফাঁকে সময়-সুযোগ বুঝে রাশিদা বিড়ি তৈরির কাজও করতেন। নিজ বিছানায় বসে মধ্য রাত পর্যন্ত বিড়ি তৈরি আর স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতেন। অধীর আগ্রহে 'তিনি এসেছেন' এই উৎফুল্লে দরজা খুলতেন। কিন্তু ব্যথিত হতেন নেশা করে ঘরে ফেরা স্বামীর রূঢ় মূর্তি দেখে। সারাদিন সাংসারিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন অন্যদিকে স্বামী ব্যস্ত জুয়াখেলা আর নেশাপানে- এই দুঃখবোধ তাকে তাড়িত করত। শারীরিক আঘাতের সাথে 'বিয়্যা করুম, বিয়্যা করুম'– এমন কথায় রাশিদার জীবনকে অতীষ্ঠ করে তুললেও এক ধরনের গা সহা হয়ে যায়।

বিয়ের দুই বছর দুই মাস পরের ঘটনা। রাশিদা উপলব্ধি করলেন তিনি মা হতে চলেছেন। এ সমাজ সবসময়ই পরিপূর্ণ দেখতে চায়। আর প্রাপ্তির বিপরীত কিছুও মনে মনে প্রত্যাশা করে। প্রথম সন্তান ছেলে। সবাই বলত কন্যাসন্তান না হলে নারীর জীবন পূর্ণ অর্থাৎ সার্থক হয় না। বউ লক্ষ্মী না- এমন কথায় রাশিদা ভাবেন, এ জীবনে কোনো কিছুতেই যেন স্বস্তি নেই। রাশিদার ভাষায়, 'সন্তান নিলে হয়তো স্বামী ঘরমুখী এবং সংসারী হবেন'। আশা-নিরাশার দোলাচলে রাশিদার কোলজুড়ে একে একে চারটি সন্তান আসে। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির পাল্লাই ভারি হয়ে ওঠে। স্বামীকে কর্মমুখী করে তোলার জন্য সুদে পঁচিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকায় ইলেকট্রনিকের দোকান করে দেন। কিন্তু অমনোযোগিতা আর বিক্ষিপ্ততার নানা তাল-বাহানায় ব্যবসা লাটে ওঠে। এদিকে সুদের টাকা টানতে টানতে রাশিদার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়।

রাশিদার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সম্পদ বণ্টনের প্রশ্ন উঠলে রাশিদার জীবনে ওঠে আরেক ঝড়। দুলাভাই বিষয়টি নিয়ে নির্বিকার থাকেন। খোঁজ আরও আগে নেওয়া প্রয়োজন ছিল- এটি রাশিদা বুঝতে পারেন অনেক পরে। নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে শালিকা-দুলাভাইয়ের বিরোধ প্রশাসনের উচ্চস্তর পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু ততদিনে দুলাভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে সকল প্রশ্ন যেন জলাঞ্জলি হয়। সম্পদের প্রাপ্য অধিকার থেকে রাশিদা বঞ্চিত হতে চান না। তাই তিনি বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেন একান্ত নিজ উদ্যোগে। কখনও শ্বশুরবাড়ি, বাবারবাড়ি, কখনও বোনেরবাড়ি অবস্থান করে রাশিদা তার প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়। কিন্তু তার পেছনে কোনো সহযোগী শক্তি না থাকায় তিনি নানাভাবেই বিড়ম্বনার স্বীকার হতে থাকেন।

নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের সময়কালের ঘটনা। জীবনে প্রথমবারে মত রাশিদা নিজের জমানো পাঁচশত টাকা আর কনিষ্ঠ কন্যাকে নিয়ে ঢাকার সেনানিবাসে আসেন তৎকালীন ফাস্ট লেডী রওশন এরশাদের সাথে দেখা করার জন্য। কোনো পরিচিতি আত্মীয় না থাকায় সেদিনের রাতটি মেয়েকে কোলে নিয়ে মহাখালী বাস টার্মিন্যালে কাটালেন। রাশিদা নিজে সারাদিন অভুক্ত থাকলেও কোলের শিশুকে একটি রুটি কিনে খাওয়ালেন। পথচারীর কুদৃষ্টি আর নানা মন্তব্যের সেই দুর্বিষহ রাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'সময়ই মানুষকে সাহসী করে তোলে। নানা জনের উদ্দেশ্যমূলক শাণিত দৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই সে রাতকে ভোর করতে হয় আমাকে।' কখন ভোর হবে সেই চিন্তায় অস্থির রাশিদা ফজরের নামাজের পর পরই পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে যান সেনানিবাসের উদ্দেশে। ফাস্ট লেডির সাথে সাক্ষাৎও হয়। ফাস্ট লেডি রাশিদার সকল কথা শোনার পর তাকে বাবার সম্পত্তির চেয়ে নিজে কিছু করার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তারও আশ্বাস দেন। শুধু আশ্বাস নয়, মিলে যায় পাঁচ হাজার টাকার একটি চেকও।

রাশিদা ফাস্ট লেডির পরামর্শে তৃপ্ত হন এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে গ্রামে ফিরে টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংকে একাউন্ট খুলে চেকটি জমা দেন। কিন্তু এখানেও বেশ গণ্ডগোল পাকায়। নগদ টাকা আসে স্বামীর দোকানের ঠিকানায়। সেখান থেকে তিন হাজার টাকা স্বামী নিয়ে নেয়। রাশিদা এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করলেও তা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। অবশিষ্ট দুই হাজার টাকা এবং নিজের পূর্বে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে শুরু করেন কার্যক্রম। 'ইসলামী সমাজ উন্নয়ন সমিতি' নামে গড়ে তোলা সমিতির প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেন বাঁশ-বেঁত-পাটের শিকা এবং মাটির চুলা তৈরিকরণসহ নানামুখী কর্মকাণ্ড দিয়ে। পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষা, নারীদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং সেলাই ও দর্জির কাজ চলতে থাকে। ৫০টি মুরগী দিয়ে পোল্ট্রি ফার্ম করেন। এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কাছ থেকে অনুদান পাওয়া দুটি মেশিন তার সেলাই শিক্ষা কার্যক্রমকে সহজ করে। উপজেলা পরিষদের দুই বাণ্ডিল টিনে সমিতির স্থায়ী ঘর হয়। এলাকার ২০০ জন নারীকে নিয়ে শুরু করা সমিতিতে প্রতি সদস্য মাসে দশ টাকা করে জমা রাখতেন। এ ব্যাপারে সভাপতি রাশিদা থানা শিক্ষা অফিসার, চেয়ারম্যান, স্থানীয় সাংবাদিক এবং গণমান্য ব্যক্তির নিকট থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পেতেন। প্রায় সাত বছর সময়কালে সমিতির নানামুখী কার্যক্রমের সাথে বিড়ম্বনাও পিছু নেয়। এলাকায় প্রভাবশালী মহলের দৃষ্টিতে পড়ে। নানা জটিলতার এক সময় রাশিদা সমিতি ছাড়তে বাধ্য হলেন। প্রতিষ্ঠিত সমিতি ছেড়ে ঘরে বসে থেকে যেন নিজের কাছেই অন্য মানুষ হযে গেলেন। দুই মাস পর একটি সংগঠনে কর্মসুযোগ মেলে। সঞ্চয়ী কিস্তির টাকা সংগ্রহ-জমা দেয়ার দায়িত্ব ছিল। মাসিক ১,৫০০ টাকা বেতনে এখানে তিনি এক বছর দায়িত্ব পালন করলেন। যেহেতু টাকা-পঁয়সার ব্যাপার তাই বিষয়টি সহজ নয়। এক ধরনের ভয় কাজ করে রাশিদার মনে। যদি কোনো আর্থিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় সেক্ষেত্রে দায়ভার বহন করার মত রাশিদা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন না। তাই তিনি কাজটি ছেড়ে দেন।

শুরু করেন সেলাইয়ের কাজ। ময়মনসিংহ থেকে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করে সেলাইয়ের কাজ সংগ্রহ করতেন। চুক্তিভিত্তিক কাজগুলো বাড়িতে বসে নিজে করতেন আবার অনেক সময় অন্যদের দিয়েও করাতেন। প্রায়ই ঢাকা আসা- যাওয়ায় রাশিদার এক ধরনের অভ্যস্ততা তৈরি হয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাজনৈতিক অস্থিরতায় (নব্বইয়ের গণঅভ্যূত্থান) বাইশ দিন ঢাকায় এক অপরিচিতের বাসায় অবস্থান করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে বোনের বাড়িতে ফিরে কেমন যেন এক অস্থিরতা বুঝতে পারেন। বোন তাকে স্থির হওয়ার কথা বলেন। 'নারীকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, শক্ত হতে হবে'- ইত্যাদি কথাগুলোর অর্থ রাশিদা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। স্বামী বিয়ে করেছে শুনে রাশিদার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কিন্তু নিজেকে সামলে নেওয়ার মত শক্ত হন এবং সেই রাত্রেই ফিরে যান শ্বশুরবাড়িতে। নিজ ঘরে অন্য এক নারীকে দেখে রাশিদা সামলে নিতে পারেন না। মাথায় যেন খুন চেপে যায়। কিন্তু ধৈর্যশীল রাশিদা পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেন। পরিবার, প্রতিবেশী সবাই স্বামীকে চাপ দেয়। কিন্তু তাতে স্বামীর টনক নড়ে না। সে রাতে রাশিদা শাশুড়ীর কাছে ঘুমায়। শুধু সেদিনের রাতই নয়, পরবর্তী অসংখ্য রাত রাশিদার কেটেছে নিঃশব্দের নীরবতায়; কেটেছে নিজ গৃহে পরবাসীর মত। ননদ-দেবর ভাবীকে ভালোবাসত বলে সংসারে থাকাটা রাশিদার জন্য ইতিবাচক হয়। পাড়াপড়শী এ বিষয়ে তোড়জোড় করলেও কারো কথায় উচ্ছন্নে যাওয়া স্বামী তোয়াক্কার করেন না। কিন্তু এরপরও স্বামী সঠিক পথে ফিরে আসবে এই আশায় রাশিদা ব্যবসা করার জন্য ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে স্বামীকে দেন। কিন্তু সমাধান নয় বরং সমস্যা আরো জট পাকায়। লোভী স্বামী 'আরো চাই-আরো চাই' মনোভাবে সব টাকাই উজাড় করে ফেলেন। শুরু হয় আবারো অত্যাচার। নিজের কাছেই টিকে থাকার যুদ্ধ চলে রাশিদার।

কর্ম সুযোগের আশায় চলে আসেন ঢাকায়। অনেক চেষ্টায় পর মোহাম্মদপুরের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মাসিক ১,৫০০ টাকা বেতনে কাজের সুযোগ হয়। এ সময় তিনি মিরপুরে বাসা ভাড়া করে থাকতেন। জীবন সংগ্রামে রাশিদা অনেকটাই পরিবারবিমুখ হয়ে পড়েন। ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন। নিজেই মনের জোরে ডান পা ভাঙা নিয়ে ভর্তি হন ময়মনসিংহ চড়পাড়ার একটি হাসপাতালে। এরপর খবর দেন বাড়িতে। দুই দিন পর ছেলে এসে তাকে নিয়ে যায়। চার মাস রাশিদা ভাঙ্গা পা নিয়ে বাড়িতেই থাকেন। এ সময়েও স্বামী অর্থ চায় এবং চলে অত্যাচার। এক বছর বিশ্রাম ব্যতীত যে কোনো মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা হতে পারে– চিকিৎসকের এই পরামর্শে রাশিদা

ঘরেই থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অত্যাচার আর অভিযোগে তিনি আবারো নতুন পথের সন্ধানী হন। আবার আগের মতোই হাঁটতে পারেন– এটি রাশিদার কাছে বিস্ময়ের কারণ হয়। এই ঘটনাটি তাকে ভাবতে শিখিয়েছে স্থবির নয়, যে কোনো মূল্যেই পথ চলতে হয়। আর সেই পথ চলা নানা প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে চলমানও রাখতে হয়।

বিকশিত রাশিদা

সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে রাশিদা যখন এক ক্লান্ত পথিক তখন এলাকার লুতফা আপা রাশিদাকে অনুপ্রাণিত করতেন। তার পরামর্শে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের আয়োজনে ২০০৭ সালে ৬-৮ ডিসেম্বর ১৮তম ব্যাচে (পূর্বাঞ্চলের তৃতীয় ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহের প্রশিকার আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে তিন দিনের প্রশিক্ষণে রাশিদার পথচলা যেন সুলিখিত রূপ পায়। বিকশিত নারীদের নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত করে রাশিদা নিজেকে শাণিত করেছেন বলে মনে করেন। রাশিদার ভাষায়, 'একজন নারী যদি আরেকজনকে সহায়তা করে, পরামর্শ দেয় তাহলে এগিয়ে চলাটা সহজ হয়।' পূর্বে 'কাজ করি-করি না' এমন একটা দোলায়িত ভাব ছিল রাশিদার মধ্যে। কিন্তু বিকশিত নারীদের নানা কর্মকাণ্ডের সফলতা দেখে তার মনে হয়েছে 'অন্য নারীদের নিয়ে আমিও জেগে উঠব।' তার স্বাবলম্বী কার্যক্রম শুরু হয় নিজ ঘর থেকেই। তাই নিজ ননদসহ এলাকায় পারুল, আসমা, সাইমা, মমতাজসহ প্রায় ৫০ জন নারীকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলেন।

জীবন বাস্তবতার নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অবিচল রাশিদা তার বঞ্চনার অতীত ভুলে যেতে চান। তৈরি করতে চান নারীদের জন্য নিরাপদ জীবন। সৃষ্টি করতে চান তাদের কথা বলা আর অধিকার আদায়ের ক্ষেত্র। তাই ভবিষ্যতে সফল এবং বঞ্চিত নারীদের নিয়ে 'নকশীকাঁথার মাঠ' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করার ইচ্ছা রয়েছে। পত্রিকাটিতে এমন নারীদের কথা থাকবে যারা স্বপ্ন লালন করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নিজেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। আর সেটিই হবে অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

অবিচল পথিকের অনন্ত পথচলা...

'কারো কাছে নত নয়; শক্ত মনই নারীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে'– জীবনমুখী এই কথা আমাদেরও শিক্ষা দেয় যে, ধৈর্যশীলতার মাধ্যমে সকল প্রতিবন্ধকতা দূরে ঠেলে সফল হওয়া সম্ভব। কথাগুলো এই প্রথম বলতে পারছেন। আর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট সেই বলতে পারার সুযোগ বা ক্ষেত্রটি তৈরি করে দিয়েছে। তাই জীবন অভিজ্ঞতা থেকে বললেন, নারীর স্বীকৃতির সমস্যা। তাদের বাঁধা অনেক, পিছুটানও বেশি। নানা অত্যাচার আর অনিয়মের কিছু অলিখিত নিয়ম নারীকে সইতে হয়। সাক্ষাৎকারে কিছুটা সময় গড়ালে ধৈর্যশীল রাশিদা বিনয়ের স্বরে জানতে চাইলেন আর কতটুকু বাকি। 'এক জীবনে বলে শেষ করার নয় এই কষ্টের কথা'– এমন বাক্যটির প্রত্যুত্তর ছিল তবুও যতটুকু পারা যায়; অন্তত অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে। শুনে ম্লান মুখ হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের আঁধারে সে হাসির ঝলক অনুপ্রাণিত করল। মনে করার চেষ্টা চলল– বাবার বাড়িতে মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য রাশিদাকে কোনোরূপ খেসারত দিতে হয় নি। কিন্তু পরের ঘরে সে মূল্য দিতে হয়েছে তাকে প্রতি পদে পদে। বড় হতে হতে বুঝতে পেরেছেন জীবনের মানে আসলেই কত কঠিন! সংসারের নানা জটিলতায় রাশিদা এগিয়ে গিয়েছেন এবং অবিচল থেকে সে পথ পাড়িও দিতে সক্ষম হয়েছেন।

শুরুর কথাটি ছিল প্রতিটি মুহূর্তের জন্য নারীকে যুদ্ধ করতে হয়। প্রতি বিন্দু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্য কঠোর মুল্যও দিতে হয়। তাই একজন সুপাঠক হিসেবে যদি রাশিদার জীবন চলার পথের সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যায়, জীবনের শুরুতে তিনি কোনো আর্থিক উপার্জনের সাথে যুক্ত ছিলেন না। ফলে বারবার সংসারে বিরোধ এবং কোথাও স্বস্তি ছিল না তার। তাই সমাজে প্রতিটি নারীর প্রয়োজন আত্মিক অবলম্বন। আর সেই অবলম্বন পথ চলতে গিয়ে প্রতিকূলতায় সম্মুখীন হওয়ার পর নয়। অথবা জীবনে সায়াহ্নে নয়ও, বরং জীবনের শুরুতেই। তবেই সম্ভব একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠা।